মোচা ফল বা কদলীর উপকারিতা।

কদলী মধুরং বৃষ্যং কষায় নাতিশীতলং।
রক্তপিত্তহরং হৃদ্যং রোচনং ক্ষয়নাশনং॥
পাকেশ্লেষ্মকরং স্নিগ্ধং যকৃৎ প্লীহবিনাশকং॥
সারকং পুষ্টিদং শীতং বিষ্টম্ভী পিত্তনাশনং॥
দাহ-ক্ষয়-ক্ষতাদীনাং নাশনং রক্তবর্দ্ধনম্।
রক্তদুষ্টি পিপাসাঞ্চ নাতিপাকে সমীরজিৎ॥
নেত্রদোষং সুহৃদ্যঞ্চ কৃমিঘ্নংমধুরং গুরু॥
বৃংহণং তৃপ্তিদংপাকে সুস্বাদু মাংসবর্দ্ধনম্।
বাতঘ্নং রতিদং মিষ্টং সুপক্কে স্থৌল্যকারকম॥
বস্তিদোষং নিহন্ত্যাশু পুষ্টিতুষ্টি প্রদায়কম্।
মূত্রদোষং ক্ষতক্ষীণং বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ॥

মোচা ফল বা কদলীর গুণ।

কদলী ফল মধুর, বৃষ্য, কষায় রস, নাতি শীতল, রক্তপিত্তহারী, হৃদ্য, রুচিকারক, ক্ষয় বিনাশক, স্নিগ্ধ, যকৃৎ প্লীহানাশক, এবং পাকে শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারী, সারক, পুষ্টিদায়ক, বিষ্টম্ভী, শীতল গুণ বিশিষ্ট এবং পিত্তনাশক। দাহ, ক্ষয়, ক্ষতাদিসহ রক্তদুষ্টি, পিপাসা ও বাত নাশক নেত্রদোষ, কৃমিদোষ নাশক, মধুর ও গুরু। ইহা নাতিপাকে অর্থাৎ পরিপুষ্টাবস্থায় অত্যন্ত বায়ুনাশক, কৃমিহারক, হৃদ্য এবং তৃপ্তিদায়ক। ইহার সুপক্কাবস্থায় সুস্বাদু, মাংসবৃদ্ধিকারী, বৃংহণ ও বাজীকরণ বিশিষ্ট, স্থূলতা বৃদ্ধি পক্ষে, রতিক্ষীণতায় এবং মনস্তুষ্টি ও পুষ্টিবৃদ্ধি পক্ষে পাকাকলা শ্রেষ্ঠ। বহুমূত্র, মূত্রদোষ, বস্তিদোষ, ক্ষীণ-ক্ষত আশু নিবৃত্তি করিয়া থাকে। আময়িক প্রয়োগে কাচাকলা পরিপুষ্টাবস্থায় চূর্ণ করিয়া শিশুগণকে গরম জল সহ ভক্ষণ করাইলে বিনা দুগ্ধে কান্তিপুষ্টিসহ জীবন ধারণ করিতে পারে। কাচাকলা খোলাশুদ্ধ পোরের ভাতে সিদ্ধ করিয়া খোলা ফেলাইয়া দিয়া বিনা তৈল সহ লবণ যোগে পিষ্ট করিয়া ভক্ষণ করাইলে দুর্জ্জয় যকৃৎ, প্লীহা, আমদোষ, এবং শিশুগণের উদরাময় ত্বরায় শান্তি হয়, এ অবস্থায় ইহা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেহ রোগের মধ্যাবস্থায় অপুষ্ট কাচাকলার ব্যঞ্জন মেহ দোষ ও জ্বালানিবারক হইয়া থাকে। কাচাকলা খোলাশুদ্ধ শুষ্ক করিয়া দুগ্ধ বা গরম জল সহ ভক্ষণ করা ব্যবস্থা। যে সকল শিশু সর্ব্বদা রুগ্ন, এবং সর্ব্বদা অজীর্ণ দোষে পাতলা বা ছিবড়ে দাস্ত জন্য জীর্ণশীর্ণ, তাহাদের এই কলা চূর্ণ অতীব ফলদায়ক। (ক্রমশঃ)

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

(শ্রীইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়)

আমাদের দেশে আমিষ খাদ্যের মধ্যে দুইপ্রকার ভেদ আছে: যথা—মাংস ও মৎস্য। মৎস্যের ব্যবহার মাংসের অপেক্ষা অধিক, শরীর পোষণার্থ মাংসের প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বিলাতের ও আমেরিকার বড় বড়

ডাক্তারগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। মত বিভিন্নতা সত্বেও তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মিশ্র খাদ্যই মানব জীবন ধারণের বিশেষ উপযোগী। "মিশ্রখাদ্য" বলিতে আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই বুঝায়। দুই শ্রেণীর খাদ্য মিশ্রিতভাবে ব্যবহৃত হইলেই মানব শরীরের পূরণ হইতে পারে। জান্তব খাদ্যে নাইট্রোজেণের অংশ বেশী, এবং নিরামিষ খাদ্যে তাহার অনেক অভাব, বিশেষতঃ অঙ্গারক পদার্থ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। মনুষ্য-শরীরে উভয়বিধ উপাদানের প্রয়োজন। আমাদের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে মাংস ভোজন সম্যক উপকারী নহে। প্রতি নিয়ত মাংস ভক্ষণ করিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা, উদাহরণ স্থলে ইউরোপের কথা বলা চলে। যেমন সেখানে সকল সময় শীত বর্ত্তমান, সেইরূপ সেখানকার লোকেরাও সেই পরিমাণে গরম খাদ্য খাইয়া থাকে। গরম খাদ্যের মধ্যে মাংসই প্রধান। শীতকাল আমাদের দেশে মাংস ভোজনের প্রশস্ত সময়। কিন্তু মাংস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। স্থূল ও সুস্থ শরীরী প্রাণীর পরিবর্ত্তে রুগ্ন পশুর মাংস ভক্ষণে নানাবিধ রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর আমরা মাংসাদি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মশলাদি সংযোগে যেরূপ গুরুপাক করিয়া খাই, তাহা সবল ও নীরোগ শরীরে পক্ষেও গুরুপাক। দুর্ব্বল শরীরের জন্য সহজ পাচ্য মাংসই প্রশস্ত।

মৎস্যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনের ভাগ কম; কিন্তু ফস্‌ফরাস অর্থাৎ প্রস্ফুরক নামক যে পদার্থ আছে, তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জন্যই মৎস্যাহারী বঙ্গবাসীগণ হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। যাঁহারা অতিশয় মস্তিষ্ক চালনা করেন বা চিন্তা করেন, অথবা মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত, মৎস্য তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মৎস্য জাতি দুই ভাগে বিভক্ত, যাহাদের মাংস সাদা, সেই জাতীয় মৎস্য সুপাচ্য ও পুষ্টিকর। বাটা, পুঁটী, মৌরলা প্রভৃতি মৎস্য এই শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়, সেই সকল মৎস্য অধিকতর পুষ্টিকর। ইহা আস্বাদে ভাল কিন্তু পাকে গুরু; রোহিত, কাৎলা, প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। কই; মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি মৎস্যে বসার ভাগ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ইহারা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গলদা চিংড়ী, ভেট্‌কি ও ইলিস মৎস্য দুষ্পাচ্য এবং অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময়, ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। সুতরাং এই সকল মাছ বেশী খাওয়া উচিত নহে। পচা মৎস্য বা শুষ্ক মৎস্য কোন ক্রমেই ভাল নহে। মৎস্যাহারের সুখে বঞ্চিত হওয়াও ভাল, তথাচ পচা ও শুষ্ক মৎস্য খাইয়া শরীরকে পীড়ার আবাসস্থান করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নয়। মাছ, মাংস আহার করিলে শরীর বলিষ্ঠ হয় ও চক্ষের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। এসম্বন্ধে একটী শাস্ত্রীয় শ্লোক আছে যথা—

কফঃ পিত্তঃ করো মৎস্য
স্নিগ্ধ কর এব চ।

অর্থাৎ মৎস্য কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি করে, কিন্তু স্নিগ্ধ মস্তিস্কের পক্ষে গুণ বিশিষ্ট।

ধরিতে গেলে, বাঙ্গালীর পক্ষে মৎস্য খাওয়া উপকারী। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা দেশে আমাদের জন্ম। সুতরাং কাল ও জলবায়ু বিশেষে আমাদের পক্ষে মাংস খাওয়াও শারীরিক তত অপকারী নহে। আমিষ ভোজীর সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ দেখা যায় না।

আমাদের দেশে হংস ডিম্বের অত্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। ডিম্ব অতি পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু গুরু পাক। ডিম্বে সালফর ফস্ফরাস অধিক পরিমাণে থাকে, তজ্জন্য উহা সহজে জীর্ণ হয় না। লবণ সংযোগে কাঁচা ডিম্ব খাইলে তাহা শরীরের বেশ পুষ্টি সাধন করে। সুতরাং ইহা শরীরের পক্ষে তত অপকারী নহে।

যাহারা মাছ মাংস না খাইয়া কেবল উদ্ভিজ্জ বা দুগ্ধ ঘৃতাদির দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে নিরামিষ ভোজী বলে। আমাদের দেশে যাহারা নিরামিষাশী, তাহাদের শরীরের অবস্থা বেশ ভাল। আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যগণ ও উচ্চ শ্রেণীর বিধবারা মাছ মাংস ভক্ষণ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের শরীরের অবস্থা তো সচরাচর বেশ ভাল বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। কারণ প্রত্যেক মৎস্যে রোগের বীজাণু আছে। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সেরূপ কোন ভয় নাই। নিরামিষাশী লোকেরা সেজন্য খুব কম সময়ই রোগাক্রান্ত হয়। উদাহরণ স্থলে হিন্দুস্থানের নাম করা চলে। তাহারা মাছ মাংস আদৌ খায় না। কিন্তু তাহারা মাছ মাংস না খাইয়া যেরূপ স্বাস্থ্যবান ও বলশালী হয়, আমাদের দেশে কয়টা মানুষ সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? মাছ মাংস না খাইলে সাত্ত্বিকভাবে হৃদয়কে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং ক্রমে ক্রমে ভগবানের পদে মতি গতি যায়! মৎস্য খাইলে রজোগুণ বৃদ্ধি করে। তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শরীরের রক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধর্ম্মেরদিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে উহা পরিত্যাগ না করিয়া থাকা যায় না। অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, করা বা মনোমধ্যে তদ্বিষয়ে আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বোতভাবে অন্যায়। যেমন হস্তির পদ চিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া যায়, সেইরূপ এই অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদয় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংস ভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংস ভক্ষণ দ্বারা হিংসা জনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে মাংস ভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হইয়া থাকে, ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত। যাহার মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংস পরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া

নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য মাত্রেরই আত্ম প্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। মাংসভোজন পরিত্যাগধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ। অতএব অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধ ব্যতীত তৃণ কাষ্ঠ বা কাণ্ডের পশু হইতে মাংস লাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংস ভোজন নিতান্ত দুষণীয় হইয়াছে। যদি ইহলোকে মাংসভোজী কেহ না হয়, তবে পশু হত্যা এক কালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংস ভোজীর নিমিত্তই জীব হত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা হত্যারূপ পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে তাহাদিগের আয়ুক্ষয় হয়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপতিত প্রাণীগণের মাংস ভোজন করে তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে ও যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিয়া, রসনাকে তৃপ্ত ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব মাংস ভোজন ও আমিষ পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজী হওয়াই মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কাশ্মীরের সাহায্য।—ভূস্বর্গ কাশ্মীর ষ্টেট হইতে একটি ছাত্রকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা স্কলার সিপ দিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল দেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গ যদি এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কতক্ষণ?

বাটী নির্ম্মাণ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতা করপোরেসন যে একবিঘা এগারকাঠা জমী দান করিয়াছেন, তাহার উপর শীঘ্র বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এজন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বেহারে আয়ুর্ব্বেদ।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বেহার গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সেখানে এজন্য আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা হইতেছে। কটকেও এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেহার গবর্ণমেণ্ট দুইহাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

চিকিৎসকের প্রয়োজন।—মেদিনীপুর মুগাবেড়িয়া হইতে সেখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মুগবেড়িয়া দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের জন্য একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন। আহার ও বাসস্থান বাদে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে প্রার্থীগণ জমীদার মহাশয়ের নিকট এজন্য পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারেন।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—সম্প্রতি কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশন মহাবোধি সোসাইটী ভবনে" হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কবিরাজ শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "অভ্র" শীর্ষক একটী হৃদয় গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভায় বহু শিক্ষিত কবিরাজ, ডাক্তার ও আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথি।—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যশোহর আয়ুর্ব্বেদীয় ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে পরিমাণ রোগীসংখ্যা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কালে আয়ুর্ব্বেদেরই জয় হইবার সম্ভাবনা। নিম্নে দুই প্রকার চিকিৎসালয়ের চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে—

এলোপ্যাথিক

সন	রোগীর সংখ্যা
১৯২০	২০৩৪২
১৯২১	১৮৮৬০
১৯২২	১৭৮১৫

কবিরাজী

সন	রোগীরসংখ্যা
১৯২০ আগষ্ট হইতে সেপ্টেম্বর	৮৭[illegible]
১৯২১	১১৯২৫
১৯২২	১২০৯৮

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়েরও রোগী সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও এই চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

জমীদার দিগের নিকট নিবেদন।—দেশের জমিদারবর্গ সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কামনায় মনোযোগী হউন ইহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষভাবে নিবেদন জানাইতেছি। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির যুগে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের জন্যই সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা, সকল চিকিৎসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি দেশের যেরূপ অনাস্থা আসিয়া পড়িল, সেইরূপ দেশবাসী ইহার ফলে অল্পায়ু ও হীন স্বাস্থ্য হইতে আরম্ভ করিল। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উগ্র বীর্য্য বিদেশীয় চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে সম্যক প্রকারে উপযোগী, সে বিষয়ের অনেক যুক্তি প্রমাণ আমরা বরাবরই দিয়া আসিয়াছি। আমাদের সেই সকল যুক্তির কথা যদি দেশের লোকে মানিয়া চলেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি হইয়া ঋষি প্রচারিত আর্য্য চিকিৎসার গৌরব পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে, সেইরূপ দেশবাসীও পুনরায় স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া জগতের কার্য্য করিবার শক্তি লাভে সমর্থ হইবেন। এই দেশবাসীর প্রাণে এই মন্ত্রের অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবার জন্য দেশের জমীদার বর্গকে অগ্রণী হইতে হইবে। আগে জমিদারবর্গ যেরূপ তাঁহাদের বাটীতে একজন কবিরাজ রাখিতেন, এখনও তাঁহারা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছেন। এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে তাঁহারা উৎসাহ দিবার জন্য আপন আপন বাটীতেই পারিবারিক চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিলে ইহাদের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিবেন। আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর চিকিৎসক নির্ব্বাচন করিয়া দিতে রাজি আছি।

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। | ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

"অভ্র"*

[কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি]

—০:*:০—

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সমূহের মধ্যে অভ্র একটী বিশিষ্ট ঔষধ। অভ্রভস্ম—অনুপান ভেদে বহুব্যাধি নাশক এবং আয়ুর্ব্বেদীয় বহু উত্তমোত্তম ঔষধের বিশিষ্ট উপাদান।

পারদ ও স্বর্ণাদি ধাতু পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ কোন কোন রোগে তাঁহাদের স্বীয় প্রণালীতে ঔষধ কার্য্যোপযোগী করিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু অভ্র ঔষধার্থ ব্যবহার করা যায়, একথা তাঁহারা ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের স্থূলদৃষ্টি অভ্রের আকার ও বর্ণ নির্দ্ধারণে নিবদ্ধ। সেই জন্য তাঁহারা আকার ও বর্ণভেদে অভ্রের বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। সেই বিভিন্ন নাম সমূহ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেননা সেই সমস্ত নামের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোন সংশ্রব নাই। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্র মতে কৃষ্ণাভ্রের উপাদান পদার্থ সমূহের মধ্যে লৌহের অংশও আছে। আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের নিকট এই বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল না। বজ্রাভ্রের সত্বপাতন-প্রকরণে লিখিত আছে যে, অভ্র হইতে সত্বপাতন কালে যে সকল অভ্রসত্ব কোষ্ঠিকাযন্ত্রের

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

অর্থাৎ হাপরের তলায় পড়িয়া থাকে, সেই গুলিকে চুম্বক প্রস্তর দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। রসতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অভ্র হইতে নিঃসৃত সত্ব হইতে জাত যে লৌহ তাহা চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, যে চূর্ণ পাওয়া যায়; উহা অঞ্জন সদৃশ। আমাদের রসশাস্ত্র এবম্বিধ সম্পূর্ণ যে, সেই সিদ্ধান্তগুলি পাশ্চাত্য রসায়ন পণ্ডিত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী এবং সকলেরই এই রসশাস্ত্র সম্যক অনুশীলন করা উচিত। তাহা না করিয়া কেবল কেমিষ্ট্রী পড়া উচিত বলিয়া ব্যস্ত হইলে কি হইবে? অনেক স্থানেই শুনি যে, কবিরাজ মহাশয়দিগের কেমিষ্ট্রী জানা উচিত।

অভ্রের উৎপত্তি ভেদ।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভগবৎ পাদাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অভ্রকে উপরস বলিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্য বাগ্ভট ও শ্রীমৎ যশোধর প্রভৃতি মনীষিগণ অভ্রকে মহারস বলিয়াছেন। রসার্ণবতন্ত্রে আছে, একদা শ্রীশ্রীদেবী পার্ব্বতী শ্রীশ্রীমহাদেবের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বীয় বীর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্খলিত বীর্য্য—ভূমিতে পতিত হয়। শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ—ভূমিভেদে উক্ত গৌরীতেজঃ চারিবর্ণের অভ্ররূপে পরিণত হয়। পৌরাণিকগণের মতে—যে সময় দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য বজ্র নিক্ষেপ করেন, জলদাগ্নি সন্নিভ বজ্র আকাশ মার্গে সঞ্চরণ কালে যে সমস্ত স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্ফুলিঙ্গ পর্ব্বতে পতিত হয়। তদবধি পর্ব্বতে অভ্র জন্মিতে লাগিল। দক্ষিণ পর্ব্বতে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক, এজন্য দক্ষিণ পর্ব্বতে জাত অভ্র অল্প সত্ববিশিষ্ট। আর উত্তর পর্ব্বত (হিমালয়ে) জাত অভ্র অধিক সত্ব ও গুণ সম্পন্ন। সুতরাং অভ্র—গগন (আকাশ) হইতে পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া গগন এবং বজ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া বজ্র নামে অভিহিত হয়। কোন কোন ঋষির মতে চারিবর্ণের অভ্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির দ্বারা বিভাগ করেন। শ্বেত—ব্রাহ্মণ, রক্ত—ক্ষত্রিয়, পীত—বৈশ্য এবং কৃষ্ণ—শূদ্র। রসশাস্ত্রবিদ মহর্ষিগণ বলেন যে, বর্ণভেদে চারি প্রকার এবং সেই চারি বর্ণের অভ্র তীব্র অগ্নি সন্তাপে পরীক্ষা করিলে (১) পিনাক (২) দর্দ্দুর (৩) নাগ এবং (৪) বজ্র এই চারি প্রকার ভেদ উপলব্ধি হয়। সুতরাং বর্ণ দেখিয়া অভ্র লইলে চলিবে না। অগ্নি পরীক্ষা বিশেষ রূপে আবশ্যক। বর্ণ ও পিনাকাদি ভেদে অভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে যে অভ্র হইতে "চিটীপিটী" শব্দ হয়, তাহাকে পিনাক কহে। কাহারও মতে অগ্নিতে প্রদান করিলে পিনাক অভ্রের স্তরগুলি শীঘ্র খুলিয়া যায়। দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে ভেক শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। কাহারও মতে দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে দিলে লাফাইয়া উঠে, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না। যে অভ্র অগ্নিতে দিলে সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে বা ফুৎকারের ন্যায় শব্দ করে, তাহাকে নাগাভ্র কহে। পিনাক অভ্র সেবনে কুষ্ঠরোগ, দর্দ্দুরাভ্র সেবনে

মৃত্যু এবং নাগাভ্র সেবনে ভগন্দর রোগ জন্মায়। বজ্রাভ্র অগ্নিতে প্রদান করিলে পূর্ব্ব বর্ণিত অভ্রাদির মত কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা বজ্রবৎ অটল বা স্থির ভাবে থাকে। এই বজ্রাভ্র পারদ গ্রাসদানে রসায়ন কার্য্যে এবং বহুবিধ ব্যাধি নিবারণে প্রযুক্ত হয়। শ্রীমৎ গোবিন্দ ও ভগবৎ পাদাচার্য্য বলিয়াছেন, বজ্রাভ্র অগ্নিতে দ্রব্যান্তর সংযোগে আপ্লাভ হইয়া সত্ত্বনিঃসরণ করে; অপর অভ্র কাচ অথবা কিট্ট ত্যাগ করে। সুতরাং সকল প্রকার অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই শ্রেষ্ঠ। অপর অভ্রের বিষয় শাস্ত্রে এই মাত্র উল্লেখ আছে,যে, রক্ত ও পীত বর্ণের স্বর্ণ সহযোগে জারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণের অভ্র রৌপ্য সহযোগে জারণার্থ প্রযুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে শ্বেত অভ্রের ভস্ম প্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা নেত্র রোগে পরম হিতকর। প্রশস্ত অভ্রের লক্ষণ স্নিগ্ধ (বেশ চক্‌চকে অর্থাৎ মলিন বা খসখসে নহে) দল বা স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু, যে বর্ণের অভ্র, সেই বর্ণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে, স্তরগুলি সহজে খুলিতে পারা যায় এবং অধিক ভার সম্পন্ন হয়।

অভ্র শোধন, জারণ ও মারণ বিধি।

অভ্রকে সেবনের বা ঔষধের উপযোগী করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্বিবিধ উপায়ের অন্যতর বিধানের আশ্রয় লইতে হয়।

প্রথম বিধান—অভ্রশোধন, শোধিত অভ্রকে ধান্যাভ্র বা সূক্ষ্মচূর্ণরূপে পরিণত করিয়া সেই চূর্ণ বা অভ্রকে মারণ বা ভস্মীকরণ এবং নিশ্চন্দ্র অভ্র ভস্ম হইলে উহার অমৃতীকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার করা।

দ্বিতীয় উপায় বিধান—অভ্র হইতে সত্ত্বপাতন করিয়া সেই সত্ত্বকে শোধন করা, শোধিত অভ্র—সত্ত্বকে মারণ বা ভস্ম করা। অভ্রসত্ত্ব ভস্মীকৃত হইলে উহার অমৃতীকরণ সম্পাদন পূর্ব্বক ঔষধার্থ ব্যবহার করা।

অভ্র শোধন।

অভ্রশোধন (১ম প্রকার) বজ্রাভ্র প্রবল অগ্নিতে দিয়া উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার কাথে ডুবাইবে। এইরূপে ত্রিফলার কাথে ৭ বার ডুবাইবে। গোমূত্রে ৭ বার ডুবাইবে, তৎপরে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কাঞ্জিকে ডুবাইলে অভ্র শুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় প্রকার—অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া শুষ্ক কুলের কাথে ডুবাইবে, এইরূপ ৭ বার করিয়া লইবে। সেই অভ্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, এই উপায়ে অভ্র শোধিত হইলে আর ধান্যাভ্র প্রস্তুত করিতে হয় না। এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে অভ্র শোধিত হয়।

ধান্যাভ্র—শোধিত অভ্রের চূর্ণের চতুর্থাংশ শালিধান্যের সহিত বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া তিনদিন কাঞ্জিকে ভিজাইয়া রাখিবে, তিনদিন পরে যে সকল সূক্ষ্ম অভ্রকণা বস্ত্র হইতে নির্গত হইবে, তাহাকে ধান্যাভ্র কহে। কাহারও কাহারও মতে উহা কম্বলে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

অভ্র মারণ। এইরূপে শুদ্ধ অভ্রকে মারণ বা ভস্ম করিতে হয়। এই মারণ বা পুট প্রদান বিধি, এক পুট, তিন পুট, দশ পুট হইতে সহস্র পুটের বিধান আছে। কিন্তু এ কথা সকল রসগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অশুদ্ধ অভ্র কখনও ব্যবহার করিবে না।

এবং সচন্দ্রিক অভ্র ভস্ম কখনও ব্যবহার করিবে না সুতরাং যতক্ষণ অভ্রভস্ম নিশ্চন্দ্র না হয়, ততক্ষণ তাহাকে পুট প্রদান করিতে হইবে।

মহামতি যশোধর বলেন,—

"যথা বিষং যথা বজ্রং শস্ত্রাগ্নি প্রাণহা যথা।
ভক্ষিতং চন্দ্রিকাযুক্তং অভ্রকং তাদৃশং গুণৈঃ॥

অর্থাৎ সচন্দ্রিক অভ্র ভস্ম সেবনে বিষাদি ভক্ষণের ন্যায় নানা প্রকার ব্যাধি জন্মায় এবং অবশেষে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আজকাল যেরূপ অকাল মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অশুদ্ধ ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবন যে তাহার অন্যতম কারণ নহে, এ কথা কে বলিতে পারে?

পুট প্রদানের সাধারণ নিয়ম এই যে, মারণীয় দ্রব্যের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথে অভ্রকে ১২ ঘণ্টা কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া 'টিকিয়া' (চন্দ্রাকৃতি পাতলা পিষ্টক) প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাত্রে ঘুঁটের জালে পুট প্রদান করিতে হয়।

অভ্র ভস্ম।

(১ম প্রকার) মারক দ্রব্য যথা, কাঁটা নটে, বৃহতী, পান, তগরপাদুকা, পুনর্ণবা, হিঞ্চা, ইন্দুরকানীপানা, ময়না ফল, আকন্দ, আদা, কট্‌কী, পলাশ বীজ ও রাখাল শসার মূল—এই সমস্ত দ্রব্যের যথাযোগ্য রস বা ক্বাথে অভ্রকে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া পুট প্রদান করিবে। অধিক পুট প্রদান করিলে অধিক ফলপ্রদ হয়। কিন্তু নিশ্চন্দ্র না হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতেই হইবে।

একপুটী অভ্রভস্ম।—ধান্যাভ্র একভাগ সোহাগা দুইভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া অন্ধ মূষায় নিরুদ্ধ করিয়া পুট প্রদান করিতে হয়। এই বিধানে একপুট অভ্র ভস্ম হয়।

তিনপুটী অভ্র ভস্ম—শোধিত অভ্র—এরণ্ড পত্রের রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুরাতন গুড় দ্বারা পুনরায় মর্দ্দিত করিয়া 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শরাবের নিম্নে বটপত্রের আস্তরণ করিয়া তাহার উপর অভ্র রাখিয়া পুনরায় তাহার উপর বটপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া গজপুটে পুট প্রদান করিতে হয়। এইরূপে মোট তিনপুটে অভ্র ভস্ম হয়।

দশপুটী অভ্র ভস্ম—শোধিত অভ্রকে অর্ক ক্ষীর দ্বারা উত্তমরূপে ১২ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিয়া 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুটে পুট প্রদান করিবে। এই রূপে অর্ক ক্ষীর দ্বারা ৭ বার পুট দিয়া বটজটা ক্বাথ দ্বারা তিনটী পুট প্রদান করিতে হয়। এইরূপে দশপুটে অভ্র ভস্ম হয়।

বিংশপুটী অভ্র—শোধিত অভ্রকে বট জটা ক্বাথ দ্বারা উত্তমরূপে ১২ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিয়া 'টীকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুটে পুট প্রদান করিবে। এই-রূপে পানের রস, বাসকের রস, হিঞ্চাশাকের রস, উচ্ছেপাতার রস, ব্রাহ্মীশাকের রস এবং বটক্ষীরের সহ মর্দ্দন করিয়া মোট ২০ পুট প্রদান করিলে অভ্র ভস্ম সিন্দূর সদৃশ হয়।

এক চত্বারিংশ পুট দ্বারা ভস্মীকৃত অভ্র। শোধিত অভ্রকে (১) মুথার ক্বাথে (২) পুনর্ণবার রসে (৩) কালকাসন্দে পাতার রসে (৪) পানের রসে (৫) আকন্দের ক্ষীরে (৬, বট

জটার ক্বাথে (৭) তালমূলীর রসে (৮) গোক্ষুরের ক্বাথে (৯) আলকুশীবীজের রসে (১০) কলার এঁটের রসে (১১) কুলেখাড়ার রসে (১২) লোধের ক্বাথে যথাক্রমে পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া তিনটী করিয়া পুট প্রদান করিবে। পরে গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া একটি করিয়া পুট প্রদান করিবে। এইরূপে ভস্মীকৃত অভ্র সর্ব্ব ব্যাধিহর এবং ইহা সমস্ত ঔষধে প্রয়োগ করিবার উপযোগী। অধিকন্তু এই বিধানে ভস্মীকৃত অভ্রের অমৃতীকরণ করিতে হয় না।

৩০পুটী অভ্র—শোধিত অভ্রকে মুথার ক্বাথ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩০টী পুট প্রদান করিবে; পরে অভ্রের ষোড়শ অংশ সোহাগা মিশাইয়া কাঁটানটের রস দিয়া ৩০টী পুট দিবে। এইরূপে ৬০ পুট দ্বারা ভস্মীকৃত অভ্র সিন্দুর সদৃশ হয়, এবং কুষ্ঠ, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে অমৃততুল্য ফলপ্রদ হয়।

১০০ পুটী অভ্র—শোধিত ধান্যাভ্রকে কালকাশুন্দে পাতার রস দিয়া শতবার পুট প্রদান করিলে নিশ্চন্দ্র ভস্ম হয়। এই অভ্র ভস্ম সর্ব্ব রোগহর এবং সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

সহস্র পুটী অভ্র ভস্ম—বজ্রাভ্রে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া গোদুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ৭ বার করিলে অভ্র শোধিত হইবে, সেই অভ্রকে ঘৃতদ্বারা লৌহপাত্রে মৃদুতাপে ভাজিবে। তৎপরে সেই অভ্রকে পাদাংশ পরিমিত শালি ধান্যের সহ বস্ত্রে বা কম্বলে বাঁধিয়া তিনদিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেই বস্ত্রগালিত সূক্ষ্ম অভ্র চূর্ণকে রৌদ্রে শুকাইবে। সেই অভ্রকে নিম্নোক্ত মারক দ্রব্যের যথাযোগ্য রসে বা ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া পৃথক পৃথক প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত ১৬টী পুট করিবে। নিম্ন-লিখিত মারক দ্রব্যের সংখ্যা ৬৩, সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যের সহ ১৬ বার পুট প্রদান করিলে অষ্টোত্তর সহস্র পুট দ্বারা অভ্র ভস্ম হইবে। মারক দ্রব্য যথা—

(১) আকন্দের ক্ষীর (২) বটের ক্ষীর (৩) মনসার ক্ষীর (৪) ঘৃতকুমারী (৫) এরণ্ডপত্রের রস (৬) মুথার রস বা ক্বাথ (৭) গুলঞ্চের ক্বাথ বা রস (৮) সিদ্ধির ক্বাথ (৯) কটকীর ক্বাথ (১০) গোক্ষুরের ক্বাথ (১১) বৃহতীর ক্বাথ (১২) শালপানির ক্বাথ (১৩) চাকুলের ক্বাথ (১৪) শ্বেত সর্ষপের ক্বাথ (১৫) আপাং পত্রের রস (১৬) বটজটার ক্বাথ (১৭) ছাগরক্ত (১৮) বিল্বপত্রের রস (১৯) গণিয়ারিছালের ক্বাথ (২০) চিতামূলের ক্বাথ (২১) গাবের রস বা ক্বাথ (২২) হরীতকীর ক্বাথ (২৩) পারুল ছালের ক্বাথ (২৪) গোমূত্র (২৫) আমলকীর রস (২৬) বহেড়ার ক্বাথ (২৭) পানশেওলার রস (২৮) তালিশ পত্রের ক্বাথ (২৯) তাল-মূলীর রস (৩০) বাসক পাতার রস (৩১) অশ্বগন্ধার ক্বাথ (৩২) বকুলগাছের পাতার রস (৩৩) ভৃঙ্গরাজের রস (৩৪) কলার এঁটের রস (৩৫) ছাতিমছালের রস (৩৬) ধুতরাপাতার রস (৩৭) লোধের ক্বাথ (৩৮) দেবদারুর ক্বাথ, (৩৯) তুলসীপাতার রস (৪০-৪১) শ্বেত ও কৃষ্ণ দূর্ব্বার রস (৪২) কালকাসুন্দের পাতার রস (৪৩) মরিচের ক্বাথ (৪৪) ডালিমের রস (৪৫) কাকমাচির রস (৪৬) শঙ্খপুষ্পীর রস (৪৭) তগর পাদুকার রস (৪৮) পানের রস

(৪৯) পুনর্ণবার রস (৫০) থুলকুড়ির রস (৫১) রাখালশশার মূলের কাথ (৫২) বামনহাটীর কাথ (৫৩) হস্তী ঘোষা পাতার রস (৫৪) কাঁচা কয়েৎ বেলের রস (৫৫) শিবালক্ষীর কাথ (৫৬) কুটবল্লীর কাথ (৫৭) পলাশবীজের কাথ (৫৮) ঘোষাপাতার রস (৫৯) ইন্দুর কানীর রস (৬০) দুরালভার কাথ (৬১) ব্রাহ্মীশাকের রস (৬২) কালজীরার কাথ (৬৩) দেবদারুর নির্য্যাস।

এই বিধানে অষ্টোত্তর সহস্র পুটীত অভ্রই অতি উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় উপায়—অতঃপর অভ্রের দ্বিতীয় উপায় লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ কিরূপে অভ্র হইতে সত্ত্ব বাহির করিয়া, সেই অভ্রকে শোধন ও মারণ পূর্ব্বক সেবন করিতে হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। সত্ত্বপাতন—(প্রথম প্রকার) সর্জ্জিকা ক্ষার, শ্বেত গুঞ্জা ও যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য অভ্রের দশমাংশ লইয়া শোধিত অভ্রচূর্ণকে মহিষীর ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মল ও মূত্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, সেই পিণ্ডগুলি কোষ্ঠিকা যন্ত্রে (হাপরে) আধ্মাত করিলে সেই পিণ্ড হইতে সত্ত্ব নির্গত হয় এবং সেই সত্ত্ব হাপরের মধ্যে পাওয়া যায়। (১)

(দ্বিতীয় প্রকার) শোধিত অভ্র চূর্ণের এক চতুর্থাংশ টঙ্কন মিশাইয়া তালমূলীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ছোট ছোট পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, সেই পিণ্ডগুলিকে হাপরে দিয়া আধ্মাত করিলে অভ্র হইতে সত্ত্ব নির্গত হইবে। (২)

তৃতীয় প্রকার—ধান্যাভ্র ৩২ পল, লাক্ষা, শ্বেত গুঞ্জা, পুঁটী মাছের আঁস, মেষদুগ্ধ, মধু, সর্ষপ, সজিনার বীজ, তিলের খোল, সৈন্ধব, হরিণের শৃঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ৩২ পল, বাসক পাতা, কাটানটে,কালকাসুন্দা, হিঞ্চা, গোয়ালিয়া পাতা ও উচ্ছে পাতার রস দিয়া পৃথ্‌ক পৃথ্‌ক মর্দ্দন করিয়া এক পল গোধূম চূর্ণ দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইবে। তাহার পর ঐ বটকগুলি খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে কোষ্ঠিকা যন্ত্রে রাখিয়া তীব্র তাপ দিবে। এইরূপ তাপ দিতে দিতে বটক হইতে সত্ত্ব নির্গত হইবে। সেই অভ্র সত্ত্বের বর্ণ কাংস্যের মত হইবে। সত্ত্ব গ্রহণের পর যে কিট্ট ভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় গোময় দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটক প্রস্তুত করিয়া পুনরায় কোষ্ঠিকা যন্ত্রে রাখিয়া তাপ দিলেই অবশিষ্ট সত্ত্বও নির্গত হইবে। নিঃসৃত অভ্র সত্ত্ব যদি অত্যন্ত কঠিন হয়, তবে মধু, তৈল, বসা ও ঘৃত দ্বারা দশবার পুট দিলে মৃদু হয়।

সত্ত্ব পাতন (৪র্থ প্রকার) একদিন অভ্রকে কাঞ্জিক দ্বারা ভাবনা দিবে, তৎপরে কলার এঁটের রস, ওলের রস ও শুষ্ক মূলার কাথ দিয়া মর্দ্দন করিয়া সোহাগা ও পুঁটি মাছের আঁস সমান ভাগে দিয়া মহিষীর বিষ্ঠা দিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলকগুলি শুকাইয়া প্রবল অগ্নিতে হাপরে আধ্মাত করিলে কাংস্যের ন্যায় অভ্র সত্ত্ব পতিত হয়। ইহার জারণ ও মারণ তাম্রের ন্যায়। এই অভ্র সত্ত্ব শীতবীর্য্য, ত্রিদোষ নাশক, রসায়নে হিতকর, বয়ঃস্থাপক। ইহার ন্যায় পুরুষত্বের তেজ বৃদ্ধিকারক ঔষধ আর নাই।

অভ্র সংশোধন বিধি—অভ্র সত্ত্বকে চূর্ণ

করিয়া পাষান খলে গব্য ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া, গব্যঘৃতে ভাজিবে। পুনরায় আমলকীর রস দিয়া ভাজিবে, তৎপরে পুনর্ণবা, বাসক এবং কাঞ্জিক দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মোট দশটী পুট প্রদান করিবে। ইহাতে অভ্র সত্ত্ব সংশোধিত হইবে। (৩)

(শোধন অন্যপ্রকার) অভ্রসত্বকে চূর্ণ করিয়া গব্যঘৃত দ্বারা অগ্নিবর্ণ করিয়া ৭ বার ভাজিবে।

সত্ত্বমারণ—শোধিত অভ্রসত্ত্বের দশমাংশ গন্ধক মিশাইয়া বটমূলের ক্বাথে ২০ পুট দিবে, পুনরায় ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ২০ পুট, মুণ্ডিরীর ক্বাথ দ্বারা ২০ পুট, শুষ্ক মূলার ক্বাথ দিয়া ২০ পুট এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা ২০ পুট দিবে। এইরূপে শত পুট দ্বারা সাধিত অভ্রসত্ত্ব ভস্ম সর্ব্বরোগে হিতকর।

অভ্রভস্মের অমৃতীকরণ বিধি—৮ পল গব্যঘৃত লৌহপাত্রে দিয়া, ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ১০ পল অভ্রভস্ম দিয়া উত্তমরূপে ভাজিবে, তাহার পর তাহাতে ১৬ পল ত্রিফলার ক্বাথ দিয়া মৃদু তাপে পাক করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। অল্পসংখ্যক পুটদ্বারা ভস্মীকৃত অভ্রের অমৃতীকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্বেত অভ্রভস্ম—শ্বেত অভ্রকে গোমূত্রাদি দ্বারা শোধিত করিয়া লইবে। পরে শোধিত শ্বেত অভ্র ১২ তোলা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মনসা ক্ষীর, বট ক্ষীর, ও অর্ক ক্ষীরে ৭ বার করিয়া ডুবাইবে। তাহারপর ঐ অভ্রকে ৪০ দিন সির্কা বা শুক্তে ভিজাইবে, তৎপরে উহাকে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে।

ঐ অভ্র চূর্ণের সহিত শোধিত পারদ ৷৷০ তোলা এবং বাবলার ফুল ১ তোলা দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটকগুলিকে পুনরায় সির্কা দিয়া খলে ভিজাইয়া প্রত্যহ একবার করিয়া মর্দ্দন করিবে। এইরূপে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া বেশ ঘন হইলে 'টিকিয়া' প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুট প্রদান করিবে। এইরূপে সির্কা দিয়া ৩ পুট দিবে। পরে এই অভ্রভস্মের অমৃতীকরণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি পরিমাণ খাইলে অন্ধও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে।

অভ্রভস্মের অনুপান নিত্য সিদ্ধনাথ বলিয়াছেন—

"যোজয়েৎ অনুপানৈর্বা তৎ তৎরোগ হরং ক্ষণাৎ।"

মকরধ্বজের ন্যায় অভ্রভস্ম ও অভ্রসত্ত্ব অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক। রসশাস্ত্রে যে যে রোগে যে যে অনুপান লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দিলাম। বুদ্ধিমান চিকিৎসক অনুক্ত রোগের অনুপান শাস্ত্র ও যুক্তিমত নির্দ্দেশ করিবেন। বায়ু শান্তির নিমিত্ত—বেড়েলা মূলের রস বা ক্বাথ; পিত্ত শান্তির জন্য (১) গোদুগ্ধ ও মিছরির অথবা (২) দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর ও চিনি সহ।

কফজন্য রোগে কটছাল চূর্ণ, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু দিয়া।

অর্শরোগে—(১) শোধিত ভল্লাতকের সহিত (২) অথবা ত্রিফলা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বড়এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, চিনি ও মধু।

মন্দাগ্নিতে—সর্ব্বপ্রকার ক্ষারের সহিত।

পাণ্ডুরোগে—ত্রিফলা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও মিছরি সহ।

রক্তপিত্তে—চিনি,বড় এলাচ চূর্ণ ও মধু।

ক্ষয়রোগে—(১) স্বর্ণভস্ম সহ (২) অথবা ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, মিছরী ও মধুসহ।

বাতব্যাধিতে—অশ্বগন্ধা, শুঁঠ, কুড়,বামুন হাটী ও মধুসহ।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুনছালের চূর্ণের সহ সহস্র পুটিত অভ্র ভস্ম, অর্জ্জুনছালের কাথসহ ৭বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী প্রস্তুত করিয়া অর্জ্জুনের সহ সেব্য।

মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে—সর্ব্বপ্রকার ক্ষারসহ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহে—বড় এলাচ,গোক্ষুর বীজ, ভূঁই আমলা, মিছরী ও গোদুগ্ধ সহ।

প্রমেহে—(১) হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু অথবা (২) গুলঞ্চের সত্ব বা পালো ও মিছরী। (৩) শোধিত শিলাজতু, পিঁপুলচূর্ণ ও স্বর্ণ মাক্ষিকভস্মসহ (৪) ত্রিফলাচূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ সহ।

ব্রণরোগে—মূর্ব্বার সত্বসহ।

নেত্ররোগে—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ।

বলবৃদ্ধির জন্য—ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও দুগ্ধ সহ।

ধাতুর পুষ্টি বর্দ্ধনার্থ—সিদ্ধির কাথের সহ।

বাজীকরণার্থ—(১) শিমূলমূল চূর্ণ, ভৃঙ্গরাজের মূল চূর্ণ, চিনি ও মধুসহ। অথবা (২) অশ্বগন্ধা, শতাবরী, শিমূলমূল, চিতামূল, তালমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও আলকুশী বীজ ও পদ্মের কন্দ—এই সমস্ত সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমুদয়ের সমান নিশ্চন্দ্র অভ্রভস্ম মিশাইয়া চিনি ও দুগ্ধ দিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন।

রসায়নার্থ—অভ্রভস্ম শ্রেষ্ঠ (শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অনুপান)।

বিবিধ রোগে—(১) ক্ষয়, অর্শ, পাণ্ডু রোগে—ত্রিফলা, ত্রিকুট, দারুচিনি, বড়এলাচ তেজপত্র, নাগেশ্বর, চিনি ও মধুসহ।

(২) পাণ্ডু, গ্রহণী, ক্ষয়, শূল, উরুস্তম্ভ গতরোগ, উদরী, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অরুচি ও মন্দাগ্নিতে—ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ ও গব্য ঘৃতসহ।

অভ্রভস্মের গুণ—অমৃততুল্য, বায়ুনাশক, পিত্তনাশক, ক্ষয়রোগনাশক, বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে, শরীরকে জরাগ্রস্থ হইতে দেয় না। আয়ুবর্দ্ধক ও শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য অথচ কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির উদ্দীপক এবং অনুপানভেদে সর্ব্বব্যাধি নাশক।

অভ্র সেবনকালীন নিম্নলিখিত দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত—ক্ষার, অম্ল, দাল, কুল, কাঁকড়ী বা কাঁকুর, করেলা, বেগুণ, বাঁশের কোঁড় ও ব্যঞ্জনাদিতে তৈল।

অভ্রের মাত্রা—শরীরের ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া ½ রতি হইতে ১ রতি। ইহার অধিক মাত্রায় সহ্য হয় না, তবে রোগ বিশেষে সহ্য হইলে আরও কিছু বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

অভ্রদ্রুতি—অভ্র প্রসঙ্গে অভ্রদ্রুতির বিষয় না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেজন্য অভ্র-দ্রুতির বিষয় লিখিত হইল। দ্রুতি অর্থে তরলতা সম্পাদন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অভ্র বা অভ্রসত্ব তরল পদার্থরূপে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুতি সাধন কহে।

শোধিত অভ্রসত্ব ও সৌবর্চ্চল লবণ সম-

ভাগে হাড়জোড়া লতার রস দিয়া মর্দ্দন করিয়া শরাবে রাখিয়া বহুবার পুট দিলে অভ্র দ্রবীভূত হয়।

অন্য প্রকার—শোধিত অভ্রচূর্ণকে বক পত্রের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে রাখিয়া উক্ত ওলকে একমাস গোগৃহের নিম্নে পুতিয়া রাখিলে অভ্র পারদের ন্যায় তরল হয়। অভ্রক্রুতির আরও বহু বিধান আছে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা লিখিত হইল না। রসশাস্ত্রে অধিকতর মনঃ সংযোগ করাইবার জন্যই এই প্রবন্ধে এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইল, নচেৎ মাদৃশ অল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

মহামতি বাগভট বলিয়াছেন—

"দ্রুতয়ো নৈব নির্দ্দিষ্টাঃ
শাস্ত্রে দৃষ্টা হপি ধ্রুবম্।
বিনা শম্ভোঃ প্রসাদেন ন
সিধ্যন্তি কদাচন॥"

একাগ্রচিত্তে রসশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই রসরূপী মহাদেব অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

এই সমস্ত জারণ মারণ কার্য্য অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর ভার দিয়া থাকিলে আর চলিবে না। এই রসশাস্ত্রের উপরই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা যদি আলস্যবশে বা অন্য কারণে রসশাস্ত্রের অবহেলা করিয়া যাই, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের মহিমাই হীনপ্রভ হইবে। অনেক স্থলে সচন্দ্রিক অভ্রযুক্ত ঔষধ রোগীর হস্তে প্রদত্ত হইতে দেখিয়া আমি এতদূর ব্যথিত হইয়াছি যে, এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি এজন্য কেহ আমার দোষ লইবেন না। শৃঙ্গাবাভ্র, নাগার্জ্জুনাভ্র ও মহালক্ষ্মীবিলাসাদি যে অত্যন্ত ফলপ্রদ, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ঔষধের জীবন—অভ্র। সেই অভ্রকে যথাশাস্ত্র শোধন মারণ ও অমৃতীকরণ না করিলে উক্ত ঔষধগুলি জীবনহীন হইয়া রোগে প্রযুক্ত হইয়া চিকিৎসকের সুবিমল যশকে মলিন করিবে। তাই বলিতেছিলাম সকলে রসশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। প্রথমে একটী বিধানে অভ্র ভস্ম করিয়া দেখিবেন। এতগুলি পুট দিয়া অভ্র নিশ্চন্দ্র হইল। আবার অন্য বিধানে পুট দিয়া দেখিবেন কত পুটে অভ্র নিশ্চন্দ্র হয় এবং আমাদের সাধের 'আয়ুর্ব্বেদ সভা'য় 'ভিষক্ সম্ভাষা সভা'র অধিবেশনে আপনাদের অভিজ্ঞাত কথা ব্যক্ত করিয়া আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের যশ প্রচারিত হউক। ইহারই নাম আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা, ইহাতে বহু রোগীর জীবন রক্ষা হইবে। আমার লেখনী যদি কিছু অসংলগ্ন কথা লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা নিজ জ্ঞানদ্বারা সংশোধিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

বুড়ী ঠানদিদির উপদেশ।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি, এ,]

পেটটা জোড়া পীলে গো যার, ছেলে হবে কি ?
ভাতের সঙ্গে খাস্‌নে তোরা কাঁচা ভেজাল ঘি।
পানটা খেতে পার, কিন্তু জরদা খৈনি কেন ?
(দেখ) বেণো জল পুকুরে ঢুকে ক্ষতি করে না যেন।
পচা, বাসি, ভেজাল প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই ;
খাদ্য নয় সে মৃদু বিষ—উহু কি বালাই !
তোমরা যদি খাদ্যাখাদ্য না কর বিচার,
ছেলেপুলেও চোখ বুঁজে গো খাবে সে খাবার।
অনুকরণ করছে তা'রা তোমার আচরণ ;
তুমিই তাদের মাপকাঠি আদর্শ অনুক্ষণ।
(যেন) ছেলেমেয়ের সাম্‌নে না হয় হাস্য পরিহাস ;—
ঘোড়া সওয়ার মান্‌বে কেন ছাড়্‌লে হাতের রাশ।
চোখ রাঙিয়ে শাসন করা সব চেয়ে যে ভাল ;
এমন করে মারবে না যায় পিঠটা হয় গো কাল।
স্নেহ, যত্ন, নীতি শিক্ষায় মানুষ কর ছেলে,—
বাল্যে কুশিক্ষাটা হ'লে যায় গো সে ত জেলে।
সদা রেখো তীক্ষ্ণ নজর শিশু-স্বাস্থ্যের প্রতি,
মায়ের এটা সুকর্ত্তব্য দায়িত্ব কঠোর অতি।
তোমার ছেলের দেহ চরিত বিগ্‌ড়ে যদি যায়,
তোমাদেরই দোষে সেটা আলস্য হেথায়।*

• • • • •

যখন তখন যাস্‌নে তোরা হোঁৎকা বরের কাছে ;—
পশুপাখীরও পাত্রাপাত্র কালাকাল বোধ আছে।

---

* অদাতা বংশ দোষেণ, পিতৃদোষেণ মূর্খতা।
রুগ্নতা মাতৃদোষেণ, কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা॥

'ঘরে' দিতে মেয়ে কেন ব্যস্ত হয় গো 'হেনা',
এঁচড়ে পাকা কাঁটাল কভু রসাল হবে না।
বয়স যখন হবে রে তার স্বামীর ঘরে যেতে,
মনটি পড়ে থাকবে সদা কখন যাবে রেতে।
তাড়াতাড়ি করিস্ কেন ব্যস্ত রে বাতুল ?
প্রকৃতির ঠিক সময় হ'লে ফুটবে চাঁপা ফুল।
আপনি যাবে ঘরে ধারে, হবে যখন টান,—
ধ'রে বেঁধে কচুকে তুই করিস্‌নে রে মান।

* * * * *

রান্না বাড়া দেওয়া থোওয়া—এও ত নারীর কাজ ;
হাতা বেড়ী ধ'রে রাঁধা—ইথে কিবা লাজ ?
রিপুর সহিত কর্‌তে লড়াই ডরায় যে নৃপতি,
লেপ ছাড়ে না যে বিপ্র গো শীতে কাতর অতি,
রাঁধ্‌তে হবে শুন্‌লে যে স্ত্রীর প্রাণটা উড়ে যায়,
বিফল তাদের জন্ম বৃথা জীবন গো ধরায়।
লেখাপড়ার কাজটা সেরে খায় গো যবে ভাত,
পাইনে ভেবে কেমন করে মুখে ওঠে হাত।
গর্ভ ধারণ শিশুপালন (গৃহ) কর্ম্ম সম্পাদন,
(কর্‌বে) অবসরে কুটীর শিল্পে অর্থ উপার্জ্জন।
স্বামী গো যার কুলি কেরাণী, দেমাক তার কি সাজে
দুপুর বেলা খাওয়ার পরে কেন মজলিস বাজে ?
অনেক কাজও কর্‌তে পারে ঘরে ব'সে নারী—
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা কেন যাও গো নবীন প্যারী ?
চালের দুটো কাঁকর বেছেও কর্‌বে উপকার,—
স্বামীপুত্রের স্বাস্থ্য সুখ কি কাম্য নয় তোমার ?
বাঁচ্‌লে তারা দশের দেশের হবে কত কাজ,
তোমারও গো হাতের 'নোয়া' বজায় থাকবে আজ।
রান্নাবাড়া ঘরকন্না—শ্রমের কাজ না করে,
সেই নারী ত হৃদ্‌রোগে আর মূর্চ্ছা অল্পে মরে।
বিলাস ব্যসন আলস্যে ঘটে প্রসব বিভ্রাট,—
যে দিকে চাই শ্রমকুণ্ঠ রুগ্ন বিবির হাট।

কুলি মজুর শ্রমিক জায়া (প্রায়) জানে না ব্যারাম ;
জরজ্বালাটা ঘিরে আছে ভদ্রলোকের ধাম।
ডাঙ্গা কেটে ডহর করে ফেল্‌বে গায়ের জোরে,
দোয়েল ডাকার সঙ্গে উঠে শয্যা থেকে ভোরে,
গৃহস্থালির সকল কর্ম্ম কর্‌বে যে সব মেয়ে,
ধন্য হবে স্বামীর কুল গো এমন রত্ন পেয়ে !
"এমন ঘরে বিয়ে আমার হয় গো 'সরলার',
পানটি সেজে খেতেও কভু হয় না যেন তার।"
উপর থেকে মাটিতে গো নামে না সে পাখী,
(আহা) এমন সাধের দিব্য বিহগ* খাঁচায় পুরে রাখি !
এ কামনা করোনা মা, সুখ নয় সে বাঁশ ,—
মাংস মেদের বোঝা বইতে কর্‌বে রে হাঁস ফাঁস ।
হিষ্টিরিয়া হবে গো তার মুহুর্মুহু ফিট ,
হয়রান হবে স্বামী দিতে ডাক্তারের ভিজিট !
পাঁচটা চালের ভাত খেয়ে তার বুকটা জ্বলে অতি,
এমন মেয়ে বিয়ে কভু করিসনে রে 'মতি'।
একটা ছেলেও দিবেনা সে সুস্থসবল দেহ ,—
সখের কাচের পুতুল নিয়ে ঘর করোনা কেহ ।
কাল শক্ত সুস্থ শিষ্ট ভদ্র ঘরের ক'নে
অমরাবতী কর্‌বে সেত ফেল্‌লে তারে বনে ।
শ্বশুর শ্বশ্রূ দেবর স্বামী ননদ পরিজন,
সবার প্রতি সমান ভাবে কর্‌বে রে যতন।
অন্তঃপুর যে ধ'রে রাখে, 'পুরন্ধ্রী' নাম তা'র,—
সুখের বাসা গড়্‌বে—ভেঙ্গে কর্‌বে না চুরমার
বিনয়, লজ্জা, নম্রতা, শুচি, নিষ্ঠা, সদাচার।
কর্‌বে তোমার ভবের গৃহ শান্তি সুধাগার।
পাড়াপড়সীর খোঁজ খবর লবে আদর ক'রে,
পরকে আপন কর্‌বে স্নেহে—বাঁধ্‌বে প্রেমডোরে।
মুখে হাসি, হাতে কাজ, পরোপকার ব্রত,
নামে রুচি জীবে দয়া (হবে) সেবা ধর্ম্মে রত ।

* Bird of Paradise=দিব্য বিহগ ।

যে কার্য্য করিবে তাহে ঢালিবে হৃদয়,
নিয়োজিবে সর্ব্বশক্তি হইবে তন্ময়।
আন্তরিক ব্যাকুলতা বিশ্বাস আগ্রহে।
জন্মিবে ভকতিপ্রীতি ঈশ্বর অনুগ্রহে।
সর্ব্বকর্ম্ম মাঝে যেন ভুলোনা ভগবানে,
উপাসনা কর্‌বে রে তাঁর কায়মনঃ প্রাণে।
একটীবারও ডেকো তাঁরে দিনান্তে নির্জ্জনে,—
পাইবে প্রেমানন্দ কত ভজন সাধনে।

* * * *

শিশুশিক্ষা মায়ের কাছে উত্তমরূপে হবে;
কেন শিশু পাঁচ বছরে স্কুলে যাবে সবে?
হিসাব পত্র রেখে স্বামীর কর্‌বে সহায়তা,
আন্‌বে দু'জন সংসারেতে সুখস্বচ্ছন্দতা।
একটু সর্দ্দি হ'লেই ছেলের ডাক্তার কেন ডাকা?
গাছ গাছড়া টোটকা ওষধ ভাল জেনে রাখা।
মিতব্যয়ী হবে নারী বুঝ্‌বে স্বামীর দুখ,
অল্পআয়েও দেখ্‌বে ঘরে আস্‌'ব কত সুখ।
রেখে ঢেকে বুঝে সুঝে চল্‌তে হবে সদা —
এমন ঘরে না এসে কি থাকবে রে বরদা?
কানা কড়িটিও তুমি রাখ্‌বে যতনে,
'যাকে রাখ সেই রাখে'—মান্‌বে নীতি মনে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল কাজে স্বামীর সহায় সতী,
ইহকালে পরকালে মিল্‌বে পরাগতি।
'পতি পরম গুরু' সতীর পূজ্য বরদাতা,—
কার্ত্তিক গণেশ তুল্য পুত্রের হবে তুমি মাতা।
চিরুনেতেই যেন শুধু রয়না (এই) মহাবাণী;
মনের মধ্যে অঙ্কিত যার সেই ত মহারাণী।
সৌভাগ্যেতে স্ফীত হ'য়ে ধরাখানা সরা
অতি বড় ভুল গো সে যে এমন মনে করা।
'আমার' 'আমার' নয় গো ভাল অতি মোহমায়া,'
শ্রী গোবিন্দ পদে সঁপো ধন দৌলত কায়া।

স্বর্ব্বধর্ম্মেতে থাকে যেন ভক্তি অবিচলা,
একটু দুঃখে হবেনা গো অস্থির চঞ্চলা।
হবেই হবে ঝড় তুফান গো সংসার পারাবারে,
তাই ব'লে কি ছাড়বে রে হাল দরিয়া মাঝারে?
এই ত বুড়ীর অভিজ্ঞতা—এই আদর্শা নারী;
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ নিশ্চয় হবে তা'রি।

বিষ বিজ্ঞান।

[ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

ভারতে—বিশেষ আমাদের পরম পূজ্যা জন্মভূমি বঙ্গদেশে বিষাক্ততার জন্য বহু জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহার দুই কারণ, এক আত্মহত্যার উন্মত্ততা, অবহেলা মিশ্রিতঅসতর্কতা ও অজ্ঞানতার ফলে বঙ্গের বহুমানিনী একটুকু সাংসারিক খুঁটিনাটি লইয়া করবী, আফিং, আরসেনিক (দারমুজ) কার্ব্বলিক এসিড, কেরোসিন ইত্যাদি যোগে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। আবার অল্পশিক্ষিত ডাক্তার কবিরাজের ঔষধালয়ে সহজলভ্য উগ্র ঔষধের অপব্যবহারে বহু জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমি এখন কাশীবাসী হইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া বৎসরে ৩।৪টি বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি—স্থান বিশেষে এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

বিষ—বলিলে কি বুঝিতে হয়, কোনটি কোন জাতীয় বিষ তাহার ক্রিয়া, গুণ, ব্যবহার এবং অনিষ্টকারিতা কি এবং নিরাময় প্রথা কি ইহাই আলোচনা করা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'বিষ' কি ইহা বলা সহজ নহে। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থে বহু কথার উল্লেখ আছে, আয়ুর্ব্বেদ বাক্যই শ্রেষ্ঠ। "স্বাস্থ্য নষ্ট যাহাতে করে তাহারি নাম বিষ। আমরা ডাক্তারি এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, যাহাদ্বারা শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য বিনষ্ট এবং জীবনী শক্তির অপচয় ঘটায় তাহাই বিষ। ইহা তরল, কঠিন, চূর্ণ, বায়বীয়, বাষ্পাকার, এবং কর্দ্দমতুল্য ইত্যাদিরূপ নানা প্রকার হইতে পারে। যে বস্তু শরীরের ক্ষতে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, নিঃশ্বাস পথে পানাহার যোগে বা যে কোনরূপেই হউক শোণিত সহ মিশিয়া স্বাস্থ্যকে বা প্রাণকে বিধ্বস্ত করে তাহাই বিষ। আবার নিত্য ব্যবহার্য্য পানীয়ও অত্যধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলেও বিষাক্তগুণ প্রকাশ

করে। কিন্তু তাই বলিয়া আলপিন, সূচ, প্রস্তর, হীরকাদি ধাতু, লৌহখণ্ড, কাচচুর্ণ, কণ্টক ইত্যাদি বস্তু ভক্ষণ করিলে পাকাশয় মধ্যে প্রস্ততিকরণ যান্ত্রিক উত্তেজনা জন্মাইয়া যে, সাংঘাতিক অবস্থা ঘণ্টায় তাহাকে প্রকৃত বিষশ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

বিষকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীতে সাধারণ বিষ বিভক্ত। তরলাকারে বিষ প্রথম শ্রেণীভুক্ত—বাষ্পাকারে বিষ দ্বিতীয়। কঠিন পদার্থ তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থাৎ যাহা পাকস্থলীতে গিয়া শিরা সমুহ দ্বারা অতি শীঘ্রই শোষিত হইয়া কার্য্য করে তাহা প্রথম শ্রেণীর বিষ। যাহা বাষ্পাকারে নিঃশ্বাস পথ দিয়া শরীরস্থ হইয়া কার্য্য করে তাহা দ্বিতীয়। আর যাহা পরিপাক হইয়া কার্য্য করিতে অধিক সময় লাগে তাহা তৃতীয়। যে বস্তু ধীরে ধীরে কার্য্য করে তাহার ক্রিয়া নির্ণয় অনেক সময় বড় অসুবিধার হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে বিষ বিশেষ কোন বস্তু সহযোগে উদরস্থ হইলে ক্রিয়ার তারতম্য হয়। যেমন আর্সেনিক (শেঁকো বিষ) ভাত রুটি ইত্যাদি সহ ভক্ষিত হইলে যত সময়ে যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে গুড়, চিনি সহ কিম্বা তরলাকারে খাইলে তাহা অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। আবার শূন্য উদরে প্রবিষ্ট হইলে অতি শীঘ্রই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী এবং দুর্ব্বল, রুগ্ন ভেদে বিশেষের ক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আবার অভ্যাস জন্যও যথেষ্ট তারতম্য উপস্থিত হয়। এমন বহু লোক আছেন যে, তাঁহারা ১ ভরি আফিং খাইয়া সুস্থ শরীরে কার্য্যাদি করেন, অনভ্যস্ত ব্যক্তি সিকি ভরি আফিং কিম্বা ৩০ গ্রেণ মরফিয়া খাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শিশুগণ ১০।১২ গ্রেণ আফিং খাইয়া প্রায়শই মারা যায়। আবার আফ্রিকা, অষ্ট্রিয়া, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশ বাসীগণ— বিশেষ যুবতীগণ সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য দৈনিক ৪।৫ গ্রেণ দারমুজ বিষ খাইয়া কার্য্যক্ষম থাকিয়া যায়। আমার একটী আত্মীয় সখ করিয়া "স্বামী" হইয়াছিলেন--তিনি কান্তি পুষ্টি রক্ষার জন্য প্রতি শনিবার ৪ গ্রেণ আরসেনিক খাইতেন—একদিন অন্ধকারে ভুলক্রমে ৮ গ্রেণ দারমুজ খাইয়া বিষাক্ত হইয়া পড়েন, আমি বহু চেষ্টায় তাহাকে রক্ষা করি—বলা বাহুল্য তিনি দৈনিক অর্দ্ধ ভরি আফিং খাইতেন। বস্তুতঃ অভ্যাস জন্য বিষ বস্তু কোন কুক্রিয়া করে না।

স্থান ভেদে বিষের ক্রিয়া—শরীরের স্থান বিশেষে বিষ প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন প্রকার বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার বিষ ধর্ম্ম জন্য বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয়। যেমন অতি উৎকট সর্প বিষ শরীরের অনক্ষত স্থানে লাগিলে কোন বিষ লক্ষণ আদৌ প্রকাশ হয় না। কিন্তু রক্ত সহ বিন্দু মাত্র মিশ্রিত হইলেই প্রাণনাশক হইয়া উঠে। এ দিকে কিন্তু বায়ব্য বিষ ফুস ফুস দ্বারা বাহিত হইয়া প্রাণ নাশক হয়। অথচ শরীরে সংলগ্ন হইলে কোন বিষ লক্ষণ প্রকাশ করেন না আবার উগ্রবিষ দেহের বাহিরে লাগিলে যেমন ক্ষতাদিতে সেবনাপেক্ষা বিলম্বে কার্য্য হয়। ইহার

কারণ এই যে, ঐরূপ কার্য্যের শোষণ শক্তি অতি অল্প। জগতের সর্ব্ব দেশেই বিষ সেবন দ্বারা আত্মহত্যা কার্য্য সম্পন্ন হয়। বায়ব্য বিষ দ্বারা বঙ্গ দেশে জীবন নষ্টের সংবাদ তত পাওয়া যায় না, তবে বর্ত্তমানে গ্যাস গৃহে কয়লার খনিতে গ্যাস টানিয়া মৃত্যু আর পুরাতন কুপের দোষে কার্ব্বনিক গ্যাসে ২।১টি মৃত্যু সংবাদ আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কঠিন দ্রব্য অর্থে অঙ্গারাদি হীরক চুর্ণ, কাচ চুর্ণ—বিষ মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং উহা হত্যা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। যাহা হউক পারদ, সিসা ও আরসেনিক বাস্পাকারে ফুসফুস দ্বারা বাহিত হইয়া সাংঘাতিক হইয়া থাকে। এমন কি বিষ শ্রেণীর কতক গুলি বস্তু উদরে প্রবিষ্ট হইয়াই শোণিত সহ মিশিবার অগ্রে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে এরূপ প্রদাহিত করে যে, তদ্বারাই রোগীর প্রাণ বিনাশ হয়। লৌহ, ধাতব, অম্ল, লবণ প্রভৃতি কোন কোন ক্ষার দ্রব্য এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

অতি প্রয়োগ—জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষিণী শক্তি আছে। ঔষধের মাত্রায় যাহা ব্যবহার হয় তাহার ক্রিয়া অবসান হইতে না হইতে আবার যদি তাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঔষধের শক্তি নিশ্চয়ই কম হইয়া পড়িবে, কিন্তু প্রবল বিষ লক্ষণ প্রকাশ হইবে। উদাহরণ স্বরূপ সুরাপায়ীগণের দৃষ্টান্তই প্রধান। ১ আউন্স সুরা দ্বারা শরীর সুস্থ এবং সবল হয়। তাহার উপর আরো—১ আউন্স প্রযোজিত হইলে উন্মত্ততা আনয়ন করে।

আইন এবং চিকিৎসা কার্য্যে—বিষ প্রয়োগ বিষয়ে রাজ শাসন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। সর্ব্বাগ্রে আইন সমস্তাই লিখিত হইল। এই বর্ত্তমান রাজশাসনে "পিনালকোর্ড" বা দণ্ডবিধি আইনের ২০৯—২০৩—৩০৬—৩০৯ প্রভৃতি ধারা প্রযোজিত হইয়া থাকে, যাহাতে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে অথবা প্রাণনাশ উদ্দেশে কোন পীড়া জন্মাইয়া দেওয়া হয়, কিম্বা মৃত্যুর কোনরূপ আশঙ্কা জন্মান হয়—তাহাই হত্যা অপরাধ বলিয়া গণ্য। প্রাণ নাশ জন্য যে কোন কার্য্য করা হয়—তাহা দ্বারা অনিষ্ট না হইলেও হত্যাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ স্থলে দোষীকে ১০ বর্ষ কারাবাস,—দ্বীপান্তর, অর্থ দণ্ড, প্রাণ দণ্ড ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিকৃত চিত্ত ব্যক্তিকে প্রাণ বিনাশ জন্য যে ব্যক্তি সাহায্য করে, তাহারও ঐরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। (৩০৬) আবার প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মঘাতিকে মৃত্যুর সাহায্য করিলেও ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং আত্মহত্যাকারীর চেষ্টাকারীকে বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আবার জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত ভেদে অপরাধের তারতম্য আছে। যদি কেহ পরের প্রাণ বিনষ্ট জন্য কোন কার্য্য করে—তাহা সফল হউক বা বিফল হউক, জ্ঞানকৃত বলিয়া কার্য্য কর্ত্তাকে অপরাধী হইতে হইবে। এই দোষে স্ত্রীলোকগণ স্বামী বশ করিবে বলিয়া যে বস্তু ব্যবহার বা কার্য্য করে তাহা জ্ঞান-

কৃত মধ্যে গণ্য। বেশ্যাগণ কু অভিপ্রায়ে উপপতিকে আয়নার পারা খাইতে দিয়া থাকে তাহাও জ্ঞানকৃত অপরাধ মধ্যে গণ্য হয়।' তবে সৌভাগ্যের কথা যে, এরূপ মোকদ্দমা এই দেশে কোন দিন উপস্থিত হয় নাই। একদিন এক ওঝা ভুত ছাড়াইতে গিয়া—প্রহার দ্বারা রোগীকে সংহার করিয়া ফেলে—তাহাতে তাহার কারা দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ধুতুরা দ্বারা এ দেশে সময় সময় লোককে উন্মত্ত করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে ঠগীগণ এই কার্য্য করিত। এই সকল দোষীগণ প্রায়ই নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। আমার ভগ্নীপতি আর ভাগিনাকে দুইটি হিন্দুস্থানী পাচক পাচিকা পিষ্টক সহ ধতুরা খাইতে দিয়া পলায়ন করে। বিচারে—ইহাদের নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

এই সমস্ত স্থানে বিষ চিকিৎসককে অতি সতর্কতা সহ কার্য্য করিতে হয়। কোন্ বিষ দ্বারা বা বিষাক্ত হইল, তাহার পরিণাম, চিকিৎসা, পুলিসে সংবাদ প্রদান, নিজের সতর্কতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ বিষ চিকিৎসককে অভিজ্ঞ এবং চতুর হইতে হইবে। এই জন্য চিকিৎসকের কর্ত্তব্য বলিয়া একটা স্বতন্ত্র প্যারা নির্ম্মিত হইল।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি বিষাক্ত হইয়াছে শুনিলেই —চিকিৎসক মহাশয় তাহার আবশ্যকীয় যন্ত্র এবং বিষঘ্ন ঔষধ সহ দ্রুতগতিতে রোগীর নিকট উপস্থিত হইবেন—আহ্বান কারীকে বিষাক্ততার কারণ, কি বস্তু দ্বারা কার্য্য হইয়াছে,—রোগীর জ্ঞান আছে কি না—অন্য অবস্থা কিরূপ আর্থিক অবস্থা ভাল কি মন্দ, কতক্ষণ হইয়াছে, রোগীর বয়স কত এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে, সুশ্রূষা করিবার লোক আছে কিনা—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া লইবেন। রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, শরীরের উষ্ণতা, শীলতা, বাক্যকথন শক্তি, জ্ঞান, অজ্ঞানতা, মুখের বর্ণ, শ্রুতি শক্তি, মুখ হইতে ফেনা বাহির হয় কিনা, গিলিবার শক্তি কিরূপ—চক্ষুর অবস্থা, প্রলাপ এবং উন্মত্ততা খিচুনী' রক্তস্রাব, পিপাসা, নিদ্রা, অস্থিরতা, (ক্রন্দন—চীৎকার ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অবগত হইবেন। কোন্ সময় কতক্ষণ ইহা ঘটিয়াছে—কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা অথবা রোগীর নিকট কোন বস্তু আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইবেন। রোগীর গৃহে অযথা জনতা না হয়—আলো-বাতাস আছে কিনা—ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন। আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহে আত্মীয়-গণকে নিযুক্ত করিবেন—চা, বরফ, বার্লি জল সংগ্রহ করিতে বলিবেন।

এইস্থানে এই বিষয়টি অতি ধীরতার সহ রক্ষা করিবেন যে, সহসা রোগীর জীবন বিষয়ে নিজে বা আত্মীয়গণ নিরাশ না হন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "আমতা আমতা" করিয়া উত্তর দিবেন। নিশ্চয় কোন কথা কহিবেননা,—অতি আগ্রহে ক্ষিপ্রহস্তে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। আবশ্যক হইলে অপর কোন সম ব্যবসায়ীর সহ পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

রোগী পূর্ণ সুস্থ না হইলে কখনোএকাকী থাকিতে দিবেন না. অথবা ক্রোধ বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

রোগী পরীক্ষা।—সুস্থ ব্যক্তি হঠাৎ অচেতন হইলে বিষাক্ত বলিয়া অনুমান করিতে হয়। আবার আহারের পর ঐরূপ ঘটিলে বিষের ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ হয়। রোগী দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং অন্য কোন পীড়াগ্রস্ত কিনা, কোনরূপ মাদকদ্রব্য বা বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত কিনা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইতে হইবে। যদি চিকিৎসক যাইয়া রোগীর মৃত্যু হইয়াছে দেখিতে জানিতে বা শুনিতে পান, তাহা হইলে কোন অবস্থায় কোন বিষ দ্বারা ঘটনা ঘটিল তাহা জানা উচিত। এতদর্থে নিম্নে কতকগুলি ভয়ঙ্কর বিষের উল্লেখ করা হইতেছে।

১। হাইড্রোসিয়ানিক বা প্রুসিকএসিড সেবনে এমন কি নিঃশ্বাস পথে গ্রহণ করিলে প্রাণনাশক হয়।

২। পটাশির সাইনাথেড—ইহাদ্বারা অতি শীঘ্রই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

৩। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, কার্ব্বনিক অকসাইড oxide অ কজ্যানিক এসিড—সেবনে অর্থাৎ যেসকল বস্তু জীবদেহে দ্রুত কার্য্য করে তাহা দ্বারা শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হয়।

৪। অহিফেন, মরফিয়া, ক্লোরোফরম, এলকোহল, ক্যাম্ফার, ক্লোরাল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা তৈমিত্যভাব সহ শীঘ্রই জীবন নষ্ট করে।

৫। এন্টিমণি –(রসাঞ্জন) একোনাইট (কাটবিষ, উগ্র অম্লদ্রাবমুক্ত (আরসেনিক), ট্যাবোকম (তামাক), এন্টীপাইরিণ, লোবেনিয়া এন্টীকেবরীণ, ফস্ফরাস ক্যাম্বিনা, থাইমল, কেনাসেটিন, নাইট্রোগ্লিসেরিণ ইত্যাদি বস্তু দ্বারা মৃত্যুর প্রাগুক্ত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

৫। বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, গাঁজা, ধতুরা, সুরা, কর্পূর প্রভৃতি বস্তু প্রলা প্রবণ হয়ে সাংঘাতিক হয়।

৬। নক্সভমিকা তাহার বীর্য্য, ষ্টিকনিয়া, এন্টীবনী, দারমুজ ইত্যাদি বস্তুদ্বারা ও ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়।

৭। ফাইজাসষ্টিগ গিন, কোনায়েম, জেলসিমিন, আরসেনিক, একোনাইট, শিসা ধাতুঘটিত ঔষধে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়া মৃত্যুর লক্ষণ উপস্থিত হয়।

৮। কনিনিকা কুঞ্চিৎ হইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয়। যথা—অহিফেন, হাইড্রেড অবক্লোরণ, কাইজাস টিগমিন ইত্যাদি।

৯। নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা কনিনিকা বিস্তৃত হইয়া রোগীর জীবন নাশ হয়। যথা—এট্রোফিয়া-বেলেডোনা, ধুতুরা, হাইওছিয়ামাস, আফিং, একোনাইট ক্লোরোফরম—এলকোহল, কোনায়ম ইত্যাদি।

১০। বেলেডোনা—ধুতুরা দ্বারা এরিঅমা অর্থাৎ চর্ম্মে গুটিকা জন্মিয়া পরে চর্ম্ম উঠিয়া যায়। হাইড্রেড অব ক্লোরাল দ্বারা গুটিকা জন্মিয়া প্রদাহিত স্থান উষ্ণ হয়। জানিয়া রাখা উচিৎ যে, বিউটিল ক্লোরাল অত্যধিক হইলে সময় সময় পীড়কা হয়। আরমিণিক দ্বারা আরক্ত জরের গুটিকা বাহির হয়।

এন্টিমণি দ্বারা পূয়যুক্ত পাণিবসন্ত গুটিকা জন্মে। পটাস ব্রোমাইড দ্বারা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা জন্মিতে পারে। মরফিয়া, অহিফেন দ্বারা ঘনবটীযুক্ত চুলকানী জন্মিতে পারে। আর এসিড পাইরোগ্যালিক এবং আর আর জেনটাই নাইট্রস (কাসটিক) এসিড্ ক্র্যাইমোকানিক দীর্ঘদিন ব্যবহারে চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া থাকে।

১১। এসিড স্যালিস্যানিক দ্বারা চক্ষের পাতা ফোলা এরিঅমা তুল্য দাগ জন্মে। কোপেরা দ্বারা আমবাতের ন্যায় রক্তময় দাগ জন্মিয়া চুলকাইতে থাকে। কাবাব চিনি ও উক্তগুণশালী। আইওডাইড অব পটাস দ্বারা একরূপ ঘনবটী জন্মে এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব হয়।

নিঃশ্বাসে বিষ নির্ণয়।

কর্পূর, নাইট্রেড্ অব বেলজোয়ান, আফিং হইড্রোসিয়ানিক এসিড্, হুইস্কি ব্রাণ্ডি, কার্ব্বনিকএসিড্ এমোনিয়া ক্লোরো-ফরম, টিংকেনাবিষ,আইওডিন, ক্রিয়োজোট, ফসফরস, টারপিন, ন্যাপথাল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর শ্বাস গ্রহণে এবং নিঃশ্বাসের গন্ধে চিকিৎসক বিষ নির্ণয় করিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বাল্য জীবনের একটী ঘটনার এই স্থানে উল্লেখ করিলাম।

আমি যখন ১৫।১৬ বর্ষের বালক, তখন একদিন কুষ্টিয়ার ঘাটে ষ্টীমারে উঠিবার জন্য আমার একটী ভাগিনেয় এবং ,পাবনার জেল দারোগাসহ উপস্থিত ছিলাম। দারোগা বাবু আমাকে এবং চাকরকে দ্রব্যাদি আগলাইতে রাখিয়া ভাগ্নেটিকে লইয়া টিকিট খরিদ করিতে গেলেন। এই সময় আমি তীরের উপরিস্থ একটী শার্শি দেওয়া ঘরের নিকট গিয়া দেখি, একটী হ্যাট্ কোট ধারী বাবু একটী শিশি হাতে করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা অতীত হইল বাবু উঠিলেন না—আমি গিয়া বড় বড় করিয়া বাবু বাবু করিয়া ডাকিলাম—উত্তর নাই। এই সময় জেলার বাবু উপস্থিত হইয়া বাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, ওগো ও ডাক্তার বাবু,—বাবু তখন জ্ঞানশূন্য—অচৈতন্য—হাতের শিশি মাটিতে পড়িল—বাবু চেয়ার সহ মাটিতে পড়িয়া গেলেন—আমি শিশিটির গাত্রে সংলগ্ন লেবেল পড়িয়া দেখিলাম—"এসিড প্রুসিক ষ্ট্রং"—তখন একটা মহা চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। আর ২।৩ জন লোক উপস্থিত হইল। সকলেই বিস্মিত, শুস্তিত। টেবিলের উপর দুই খানা কাগজ লিখা আছে—তাহার ১ খানিতে "হা হতভাগিনী! কুমারী তোর মনে এই ছিল—কুলে কালি দিলি—আমি চলিলাম, ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে। পুলিশ সাহেব, আমি নিজেই জীবন ত্যাগ করিলাম। অপরখানি ডাক্তারের পিতামাতার নিকট লিখিত— * * * শ্রী * * * বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপস্থিত লোকগণ স্থির করিলেন—বাবুর স্ত্রী কুচরিত্রা, এই জন্য বাবু হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ খাইতে গিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। সেইদিন হইতে এসিড প্রুসিকের নাম এবং তাহার একটুকু পরিচয় পাইলাম। তাহার পর প্রাপ্ত বয়সে ডাক্তারী পড়িয়া কলেজেই উহার অন্য পরিচয় পাইয়াছি।

যাহা হউক মুনকমাইবনি নিম্নলিখিত

দ্রব দ্বারা—লালা নিঃসরণ হয় না। একোলাই ক্যান্থারিস পারদঘটিত ঔষধ। তামাক এমনিয়া একসালজিন ইত্যাদি। আবার কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শ্বেতবর্ণ এবং শক্ত হয়। নাইট্রিক এসিড দ্বারা শ্বেত-পীতাভ হয়। এমনিয়া ও সোডা পটাস দ্বারা এপিথেলিয়ম বিচ্ছিন্ন হয়। আবার একোনাইট ও বার-সিভ্ সাবলিমেট দ্বারা মুখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা অবশ হয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা বমন উপস্থিত হয়। যথা—আর্সেনিক দ্বারা রক্ত এবং পাটল বর্ণ বমন হয়। ডেজিটেনিস দ্বারা সবুজ বর্ণ বা ঘাসের বর্ণের ন্যায় বমন হয়। ফস্‌ফরসের বমিত পদার্থ অন্ধকারে জ্যোতিঃবিশিষ্ট হয়। কল সিনথ দ্বারা বমন হইয়া বমনতুল্য ভেদ উপস্থিত হয় এমনিয়ার বমনে সুতার ন্যায় পদার্থ নিঃসৃত হয়। উহাতে হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড দিলে ধুম উৎপত্তি হয়। ভিরেট্রাম ব্রাইওনিয়া ও আইডিন দ্বারা কটা বর্ণ পদার্থ বমিত হয়। তুঁতেতে নীল রং বিশিষ্ট বমি হইতে থাকে। আবার নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা ভেদ উপস্থিত হয়—দারমুজ (আরসেনিক) সরক্ত ভেদ হয়, এন্টিমণি ও করসিভ সাবলিমেট দ্বারা সবুজ রক্ত রক্ত ভেদ হয়। ক্যান্থারিস দ্বারা কর্দ্দমাকার—দুর্গন্ধ ভেদ হয়। ইন্দ্রবারুণী, জয়পাল, ব্রাইওনিয়া, আইডিন ডিজিটেলিস্ ও কনচিকম দ্বারাও ভেদ হয়। সিস্ ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীর নাভি প্রদেশে চাপ দিলে বেশ আরাম অনুভব হয়। তাম্রধাতু আর কনচিকাম দ্বারা পেটজ্বালা বেদনা উপস্থিত করে। আবার শিসা আর্সেনিক দ্বারা হাতে পায়ে খাল ধরে, নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা শ্বাস গ্রহণে শরীর বিষাক্ত হয়।

যথা—ইথর ক্লোরাফরম হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ এমনিয়া বেঞ্জন, কার্ব্বনিক গ্যাস, কার্ব্ব অক্সাইড্ কোন বা কয়লার গ্যাস ইত্যাদি।

এই দেশে মূর্খ এবং কুচরিত্রাগণ নিম্ন—লিখিত দ্রব্য দ্বারা গর্ভপাত করাইয়া থাকে, ইহাতে প্রায়ই শিশু বা গর্ভিণী হত্যা হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে গর্ভিণী না মরিলেও একেবারে অসুস্থ হইয়া যায়। এমন অবস্থা কখনো উপস্থিত হয় না যে, চিকিৎসককে গর্ভ নষ্ট করিয়া কোন কার্য্য করিতে হয়, প্রত্যুত ইহার জন্য বরং সাবধানে ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়। প্রত্যেক চিকিৎসককে বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীরোগীর চিকিৎসক করিতে গিয়া রোগিনী গর্ভিণী কিনা জানিয়া ঔষধ ব্যবহার করাইতে হইবে। নিম্নলিখিত বস্তু দ্বারা গর্ভ পাত হইয়া থাকে—অর্গট, রেউচিনী, ইন্দ্র বারুণী সেভিনটপস, পেনিয়াল, হিকারী, পিকারী হনিবাটাৎ, মুসব্বর আনারস, আফিং আকন্দ ইপিকা একটিয়া, রেমিমোস, পল সেটিলা, চিতার শিকড়, মেন্দিপাতা ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্য ভিন্ন ভারতীয় নিম্ন-লিখিত উদ্ভিদগুলি যেমন বিষাক্ত তেমনি সহজ প্রাপ্য। আফিং এবং করবী ফুলের বীচি যাহাতে গৃহ মধ্যে না আসিতে পারে, প্রত্যেক গৃহীর সেবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি থাকা নিতান্ত উচিত। ডাক্তারী করিতে গিয়া

[প্রায়ই দেশী উদ্ভিদের আবশ্যক হয় না বটে কিন্তু আমার ন্যায় দেশপ্রিয় ও দেশভক্ত ডাক্তারগণ সময় সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এবং মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেশীয় উদ্ভিদে আর কবিরাজী মুষ্টি-যোগে যে কার্য্য হয়, বিদেশী শিক্ষায় বিকৃত দেশবাসী ডাক্তারীর বড় বড় ঔষধে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার এই উক্তি আয়ুর্ব্বেদ ভক্তির অনু-মূলক নহে—ইহা বহু পরীক্ষিত, বাঙ্গালায় ৩১ বর্ষ এবং কাশী প্রদেশে ১৫।১৬ বর্ষ ডাক্তারী চাকুরী, স্বাধীন ব্যবসা করিয়া বহু স্থানে বহু রোগীতে এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিয়াছি। যাহা হউক অতঃপর যাহা এতক্ষণ বলিয়া আসিতেছি—তাহাই বলি।

নব্য উদ্ভিদগুলি এই যথা—জয়পাল, এরণ্ড বীজ বাগভেরেণ্ডা, চিতা, ভেলা, করবী উচ্ছুড়া, আকন্দ, মনসা সিজ, হিজলি বাদাম, মাকাল, তীতলাউ, কুকুরী, বিঠা, ধুতুরা, গাঁজা, ভাং, তামাক. অমৃত (কাট্‌বীষ) কুঁচ বা গুঞ্জামূল, কুচ্‌লে ইত্যাদি।

বিষচিকিৎসকের আবশ্যকীয় দ্রব্য।

একটী ব্যাগে কি বাক্সে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবেন —(ক) ষ্টমাক পম্প, ষ্টমাক টিউব। এনিমা সিরিঞ্জ, ইসাকেগাজ টিউব, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, রবরের গাম, ইলেকট্রিক ক্যাথিটার, বমন কারক ঔষধ বর্গ যথা ঝিঙক সালফ্‌ ½ ড্রাম করিয়া ৪৫ টি পুরিয়া, ½।১০ গ্রেণ হিসাবে পালভ ইপিকা ৩।৪টি পুরিয়া (খ) এপোমরফিয়া সলুসন। আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লইবে বা প্রস্তুতি দ্রব্য রাখিবে। (গ) উত্তেজক বস্তু যথা—ব্রাণ্ডি ৪।৫ আউন্স, স্যালেভলেটাইল ৪ আউন্স ½ হইতে ১ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার হইবে। স্প্রীট ক্লোরফরম (ইথর ক্লোরিক) ৪ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রা (ঘ) কাপি ৪ আং জলসহ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার হইবে। গ্রেণ ২০ কুড়িক কেফিন সোডা স্যালিসিলেট টেবলয়েড বা গুঁড়া।

নিম্নলিখিত প্রতিষেধক Antidod গুলি সংগ্রহ রাখিবে। যথা—ফেরি ডাই-লাইজড্‌, ভিনেগার বা এসেটিক এসিড, সিরাপ ক্লোরাল ফ্রেঞ্চ অয়েল অব টারপিন, ইহা ফসফরস বিষের antidod বিশুদ্ধ ক্লোরাফরম। ব্রোমাইড অব পটাস ট্যানিক এসিড। এমিলিনাইট্রেড্‌ ক্লোরাফরম এবং এবং একোনাইট বিষয়। লাইকর মরফিয়া পাইলোকারপিন নাইট্রেড এট্রোফিয়া বেলে-ডোনা বিষজন্য অতি আবশ্যক।

বিষাক্ত রোগীকে বমন করান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য—এই জন্য হাইপোডারমি পিওকি নিতান্ত দরকার কেননা যে স্থানে রোগীর গিলবার শক্তি থাকেনা, তখন ইহা দ্বারা কোন ভাবী অসুবিধা উপস্থিত হয় না। মাত্র দুই একস্থানে সামান্য বিবমিষা থাকিয়া যায়। ইহার জন্য হয় পাঁচ ফোঁটা এপো-মরফিয়া বা প্রস্তুত করণ টেবলয়েড ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ব্যতীত ফট্‌কিরি চূর্ণ, এমন কার্ব্ব ভাইনাম, এন্টিমণি টারটার এমে-টিক তুঁতে, পালভ ইপিকা, সরিষা চূর্ণ ঝিঙক সালফ্‌, ক্লোরাইড অবসোডা কিম্বা পল্লি সুলভ মৎস্য ধৌত জল বমন জন্য ব্যবহার হয়। আমি প্রায় স্থানেই ইপিকা মিশ্রিত

ন্নিডক সানক ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে সহজে বমি করাইয়াছি. পরিণামে কোন বিঘ্ন হইতে দেখি নাই।

ষ্টমাক পম্পশূন্য বিষ চিকিৎসা বড় অসুবিধার কার্য্য। কেন না পাকাশয় ধৌত করা বড় দরকার। স্থান বিশেষে আমি উপস্থিত ক্ষেত্রে রবারের নল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছি। একদিন একটি পল্লিগ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়া একটা আফিং বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা করি, ষ্টমাক পম্পের অভাবে পল্লি সুলভ কলাগাছের ভিতরের মাইজ অগ্নি-তাপে কোমল করিয়া মাখন মাখিয়া কার্য্য সারি, ইহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়। এই জন্য বলি, বিষচিকিৎসকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা চাই। যাহা হউক ষ্টমাক পম্প বিষ চিকিৎ-সার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

বিষাক্ত রোগী হাতে পড়িলে ডাক্তার এবং আত্মীয় গণকে ধীরে স্থির ভাবে অথচ ক্ষিপ্র হস্তে কার্য্য করিতে হইবে, একেবারে হতাশ বা পুর্ণ উৎসাহ লইয়া ঔদাস্য করা চলিবেনা। বিষ লক্ষণাক্রান্ত রোগী উপস্থিত হইলে গৃহে একটা ব্যস্ততা এবং ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এমন কি চিকিৎসক একদ্রব্য চাহিলে অন্য দ্রব্য আনিয়া বিরক্ত জন্মায়। এক দিন একটী যুবক রংমশাল পোড়াইতে পোড়াইতে গন্ধকের ধুমে সহসা চৈতন্য হারাইয়া পড়িয়া যায়। নিকটে একটী ডাক্তার বিবাহিত হইতে ছিলেন, তিনি ঘটের উপর হইতে কন্যার হস্ত সহ আবদ্ধ হস্ত টানিয়া দ্রুতপদে বিবাহ আসর হইতে বাজী পোড়ান স্থানে উপস্থিত হইয়া রোগীর জ্ঞান জন্মান জন্য নাকের মধ্যে লবণ জল "ফু" দিয়া দিবেন বলিয়া কিছু তুলসী রস এবং লবণ চাহেন। সম্প্রদাতা পুষ্পপাত্র হইতে তুলসী রস করিয়া কুশির মধ্যে করিয়া দিলেন, কিন্তু গৃহের রমণীগণ উৎসব মধ্যে একটা অশুভ আকস্মিক ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া লবণের পরিবর্ত্তে দোবরা চিনি দিয়া ফেলি-লেন—ডাক্তার তুলসী রস সহ উহা মুখে করিয়া রোগীর নাকে দিবার সময় আস্বাদে বিরক্ত হইয়া ফেলিলেন, —প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া 'হাবা মাগী গুলো" বলিয়া অভদ্র বাক্য বলায় তাঁহার নিন্দা হইল। যাহা হউক প্রাণ রক্ষার কার্য্য করিতে হইলে তাহা ধীরতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া চাই। বিষ চিকিৎসক ধীর স্থির প্রকৃতি চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ মিষ্ট ভাষী, অল্পে তুষ্ট এবং সমাজিক হইলে প্রায়ই কৃতকার্য্য হইবেন।

একদা গোঁয়ার প্রকৃতি আলস্য প্রবণ অল্প শিক্ষিত এক পল্লি ডাক্তার একটী করবী বিষাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় যাইতেছি বলিয়া অযথা বিলম্ব এবং আহ্বান কারীর সহ রুক্ষ ব্যবহারে গৃহস্থগণকে বিপদে বিরক্ত করিয়া রোগীটি বিনাশ প্রায় করিয়া তুলিয়া ছিলেন, শেষে শ্রীহরির কৃপায় একটী শিক্ষিত শান্ত পল্লি কবিরাজ বহু কষ্টে রোগীর জীবন রক্ষা করেন। যাহা হউক আমি "বিষবিজ্ঞান" প্রবন্ধ লেখক, সুতরাং আমাকে প্রত্যেক বিষবস্তুর চিকিৎসা ভালরূপ লিখিতে হইবে। সেইজন্য প্রত্যেক দ্রব্যের বিষাক্ত-তার চিকিৎসা লিখিত হইল। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয় হইলেও বাধ্য হইয়া পাঠক-গণকে বিরক্ত করিয়াছি।

রাজবৈদ্য।

[শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ]

(১)

ম্লান মুখে আসি কহিল গৃহিণী
বৈদ্যরাজ নারায়ণে,
"তণ্ডুল বিহীন ভাণ্ডার আজি গো,
থাকিবে কি অনশনে ?

(২)

কপর্দ্দক তব নাহি উপার্জ্জন
কেবলি করিছ দান,
ধনী কি দেশের নাহি কেহ আর,
নাহি কি কাহারো প্রাণ।

(৩)

আতুরের সেবা ভিষক্-সকাশে,
জানিগো মহত কাজ।
কিন্তু অবশেষে ভিখারী সাজিতে
পাপে নাকি মনে লাজ ?

(৪)

ঋষির আদেশ শুনিয়াছি প্রিয়!
তোমারি ত মুখে কত,
রোগীর নিকট করিবে গ্রহণ
অর্থ, প্রয়োজন মত।"

(৫)

"গৃহিণি! এরা যে বড়ই গরীব,
যাহারা আমার পাশে,
করাল ব্যাধির ভীষণ পীড়নে,
জর্জ্জরিত হয়ে আসে।

(৬)

অন্নাভাবে শীর্ণ, অর্থাভাব গৃহে
পথ্য কভু নাহি পায়।
কিরূপে তাদের চাহিগো অর্থ
পরাণ ফাটিয়া যায়।

(৭)

সুস্থ তাদের করিগো কেমনে
পথ্য না কিছু দিলে।
দুঃস্থের সেবা পরম ধর্ম্ম
জান নাকি মহীতলে।

(৮)

ভেবনা গৃহিণী! তণ্ডুলের তরে,
নাহি হবে অনশন।
দেশের নৃপতি, রাজবৈদ্য; মোরে—
করেছেন নিয়োজন।

কালা জ্বর

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কালাজ্বর বলিতে যে জ্বরকে বুঝায় তাহা বিষম জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু ইহার প্রায় তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট ম্যালেরিয়া জ্বরও বিষম জ্বর। সাধারণ চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয়, কালাজ্বর হয় না। দোষ-দূষ্যের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিলে উভয়ের পার্থক্য খুব অল্পই দেখা যায়, তবে চিকিৎসায় ফল না পাওয়ার প্রতি কারণ কি ইহাই একটী সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আমাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে কালা-জ্বর যে পৃথক ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে। উভয় রোগের লক্ষণ গুলি দেখিলে এক মাত্র কালা-জ্বরে রোগীর ত্বকের বর্ণ যে বিকৃত হয় ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহা হয় না। কালা-জ্বরে ও সকল ক্ষেত্রেই সকল সময় বর্ণের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। ডাক্তারী মতে রক্তের বীজাণু পরীক্ষা দ্বারা পার্থক্য নির্দ্ধারণ অনেক সময় বিপজ্জনক বলিয়া সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে। সম্প্রতি ডাক্তার গণ রক্তের আর এক প্রকারে পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার নাম Aldihyde teste. তাঁহারা সেই মতে রক্ত পরীক্ষা করিয়া কালাজ্বরকে ম্যালেরিয়া হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন। আমাদের যখন দোষ-দূষ্যের সম্বন্ধ কল্পনা দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে তখন Aldihydeteste এর দ্বারা বিশেষ লাভবান হইব ইহা মনে হয় না, সুতরাং আমাদিগকে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করিয়া চিকিৎসায় যদি সুফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উপশয়ানুপশয় দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে যে ইহা সাধারণ বিষম জ্বর হইতে একটী স্বতন্ত্র ব্যাধি। মহর্ষি চরক বলেন—

শীতোষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষাদৈ্যরুপক্রান্তাশ্চ যে গদাঃ।
সম্যক্ সাধ্যা ন সিধ্যন্তিরক্তজাংস্তান
বিভাবয়েৎ"॥

ইহা দ্বারা বুঝা যাবতেছে যে, কালা-জ্বরে রক্তদুষ্টি থাকিবেই থাকিবে। সাধারণ বিষম জ্বর হইতে ইহার ইহাই পার্থক্য এবং এই জন্যই সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যায় না। এই শ্লোকের টীকায় চক্রপাণি বলেন,

"প্রদুষ্ট শোনিতাশ্রয়ান্ত বাতাদয়ঃ স্বাশ্রয়প্রভাবাৎ ন স্বচিকিৎসা মাত্রেন প্রশাম্যন্তি।"

সুতরাং এই রোগে একদিকে যেমন বিষম জ্বরের চিকিৎসা করিতে হইবে অন্যদিকে সেই প্রকার প্রদুষ্ট রক্তকে সাম্যাবস্থায় অনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ রক্তজ রোগ সকলের চিকিৎসা সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলেন "কুর্য্যাচ্ছোণিত রোগেষু রক্তপিত্ত হরীং ক্রিয়াম্।"

চক্রপাণি বলেন, "রক্তপিত্ত হর ক্রীয়াদয় যথা যোগ্য তয়া বোদ্ধব্যাঃ।"

এইখানে "যথাযোগ্যতয়া" এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে যেগুলি তদ্‌রোগে প্রযুক্ত হইলে একদিকে যেমন সেই সকল রোগ প্রশমন করিতে সমর্থ হয়, অপর দিকে রক্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে। এই প্রকারে ঔষধ বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কালাজ্বরের জ্বর সতত হইলে উহা রক্তধাত্বাশ্রয়ী। প্লীহারোগে রক্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডু ও শোথ রোগে রক্তের স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং কালাজ্বরে রক্তদুষ্টি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, এজন্য চিকিৎসাকালে রক্তের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথম যখন Typhpid Symptoms লইয়া জ্বর হয়, তখন কালাজ্বরের কোন লক্ষণই বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় সাধারণতঃ দোষের অবস্থা বিচার করিয়া চিকিৎসা করা হয়। এই সময় যদি জ্বরের বেগ দুইবার থাকে, তাহা হইলে পলতা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি, কটকী—মিলিত ২ তোলা, জল ॥৵ সের, ।৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই পাচন সেবন করিতে দেওয়া ভাল। অন্য ক্ষেত্রে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে জ্বর নিবৃত্ত হইলে আর ভবিষ্যতে কালাজ্বর হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

জ্বর পুরাতন হইলে পুরাতন জ্বরের যে সকল ঔষধ, যাহা রক্ত ও পিত্তের প্রশমক—যেমন চন্দনাদি লৌহ, ভানু চূড়ামণি প্রভৃতি অবস্থোচিত অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। পুরাতন জ্বরে রোগীর রক্ত ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে, পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ প্রয়োগ করা উচিত।

পুট পাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহে—লৌহ থাকার জন্য রোগীর রক্তকণিকা বৃদ্ধি পায়। মুক্তা, শঙ্খ, শুক্তি, প্রভৃতি ক্ষার জাতীয় দ্রব্য থাকায় পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এবং রক্তের যে ক্ষার ধর্ম্ম কমিয়া যায়—তাহাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাম্র—যকৃৎ প্লীহার বিকৃতি নষ্ট করে, সুতরাং দ্রব্য গুণ বিচার করিয়া দেখিলে পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ এই রোগের পাণ্ডু, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য এবং রক্তের ক্ষার ধর্ম্মাল্পতা নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং শোথাদির আশঙ্কা থাকে না। জ্বরের বেগাধিক্য থাকিলে বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব—পটোলের রস অথবা ক্ষেত পাঁপড়ার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে এক দিকে যেমন জ্বরের বেগ মৃদু করিয়া আনে, অন্যদিকে সেই প্রকার রোগীর বলাধান করিয়া রক্তের মৃদু গতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া আইসে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে ইহার সহিত অর্দ্ধ রতি মকরধ্বজ মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

প্রথম অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকে, এইজন্য চিকিৎসাকালে প্লীহা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য দেখিয়া বিশেষ গোলযোগের মধ্যে পড়িতে হয়, কারণ প্লীহাধিকারের অনেক ঔষধ বিরেচন গুণবিশিষ্ট, ঔষধ দেখিয়া অনেক সময় সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারেরই সমধিক সম্ভাবনা; কারণ কালাজ্বরে অতিসার একটী প্রধান উপদ্রব, বর্ত্তমানে কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলেও উহা ভাবী অতিসারের

পূর্ব্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং নবিরেচনম্"।

এই সময় বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভাবী অতিসারকে আবাহন করা হয় মাত্র। কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য রোগীর যদি উদরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা হইলে;—

"কামন্ত পয়সা তস্য নিরূহৈর্ব্বাহরেন্মলান্।"

রোগীকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইলে দাস্ত পরিস্কার হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, রোগী যদি অত্যন্ত ক্রূর কোষ্ঠ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধেও তাহার দাস্ত পরিষ্কার হয় না, সেই ক্ষেত্রে নিমছাল, যষ্টি-মধু, কিস্‌মিস্ ও কট্‌কী—এই চারিটী জিনিষের ক্ষীরপাক করিয়া দেওয়া উচিত এবং পথ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পেয়া ব্যবস্থেয়:—

"কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়ং শৃতাংজ্বরী।
মৃদ্বীকা পিপ্পলীমূলং চব্য চিত্রক নাগরৈঃ॥"

সম্ভব হইলে নিরূহন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

প্লীহা ও যকৃতের জন্য যকৃদরি লৌহ, রোহিতক লৌহ এবং এবং বৃহৎ লোকনাথ রস প্রয়োজ্য। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ লোকনাথ রস একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহাতে অধিক পরিমাণে কড়িভস্ম থাকার জন্য প্লীহা রোগীর অনেক সময় মুখে ক্ষত বা দাঁতের গোড়া হইতে যে রক্তস্রাব হইতে পারে. তাহার আশঙ্কা থাকেনা। ঔষধের অনুপানরূপে দারুহরিদ্রা প্রয়োগ করা উচিত। দারুহরিদ্রা যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য এবং পাণ্ডুরোগ নাশক, সুতরাং দারুহরিদ্রা সহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে যকৃতের ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাণ্ডুভাব বিদুরিত হয়। দারুহরিদ্রা—চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া সেই ঘৃষ্ট দ্রব্য দুই তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রয়োগ করা উচিত। দারুহরিদ্রার অপর গুণ রক্তের বিষ দোষ নাশক, সুতরাং দারুহরিদ্রা প্রয়োগে কালা-জ্বরের যে রক্তদুষ্টি তাহাও প্রশমিত হয়।

অতিসার থাকিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক—ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ প্রয়োজ্য। রোগের অবস্থা বুঝিয়া দিবসে একবার বা দুইবার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাশয় থাকিলে মুথার রস ও মধুসহ, এবং আমের সহিত রক্ত বিদ্যমান থাকিলে কাঁটান'টের মূল চালুনি জলের সহিত বাটিয়া তাহার রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য। অতিসারের প্রাবল্য থাকিলে, অবস্থা বুঝিয়া দুই এক বটী কর্পূর-রস ও চালুনি জলসহ দেওয়া যায়। রোগ পুরাতন এবং শোথ সংযুক্ত হইলে লৌহ—পর্পটী ছাগ দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজ্য। শোথের উপক্রম বুঝিলে নবায়স লৌহ পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োগ করা উচিত। ইহা পাণ্ডু রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃদ্‌পিণ্ডের বলকারক এবং রক্তবর্দ্ধক এই ঔষধটী সুশ্রুত বলিয়াছেন, সুতরাং প্রমেহ জন্য রক্তদুষ্টি রোগেও ইহার কার্য্যকারিতা বিদ্যমান আছে। শোথে প্রায়ই প্রস্রাবের গোলযোগ দেখা যায়। নবায়সলৌহ সেবিত হইলে পাণ্ডু, শোথ, মূত্রদোষ এবং রক্তাল্পতা নষ্ট হয়। ইহা কুলেখাড়ার রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য। শোথ দেখা গেলে পুনর্ণবার রস ও মধুসহ, কিন্তু শোথের সঙ্গে উদরাময় থাকিলে লৌহপর্পটী

দিতে হইবে। শোথ—জলোদরে পরিণত হইলে ক্রম বৃদ্ধিমাত্রায় পঞ্চামৃত পর্পটী প্রয়োজ্য।

মুখে ক্ষত দেখা দিলে খদিরাদি বটীকা মুখে রাখিয়া চুষিতে দেওয়া এবং নিমপাত, অনন্তমূল, ও খদিরের কাথে কিঞ্চিৎ ফিটকারী মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ সেই কাথের কুলী করিতে দেওয়া উচিত। ঘায়ে যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধরতি মকরধ্বজ, এক-রতি মাণিক্য রস ও অর্দ্ধবটী মহালক্ষ্মীবিলাস একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের রস ও মধু সহ সেবন করাইতে হইবে। সোহাগার খৈ ও রসমাণিক চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত গুলিয়া মুখে লাগাইতে হইবে। দাঁতের গোড়া হইতে কিংবা মুখ হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে রক্তপিত্তঘ্ন ঔষধ যথা—আমলাস্ত লৌহ রক্তপিত্তান্তক লৌহ প্রভৃতি লাক্ষা চূর্ণ ৵০ আনা, চিনি ও ছাগদুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিতে হইবে। দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত আসিতে থাকিলে ফিট্‌কারি চূর্ণ দাঁতের গোড়ায় চাপিয়া দিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ-সাহিত্যভূষণ]

সকল প্রকৃতির রোগীকে এই প্রকারের পথ্যের ব্যবস্থা করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। রোগীর প্রকৃতিভেদে, জাতিভেদে, দেশভেদে এবং ঋতুভেদে যে পথ্যের প্রভেদ হইয়া থাকে,—একথা সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। তরুণ জ্বরে দুগ্ধ—মাংসভুক, ইংরাজের সুপথ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্নাহারী বাঙ্গালীর শরীরে অবস্থা-বিশেষে দুগ্ধ বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মধুর দ্রব্য ও সুশীতল পানীয় পিত্ত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে পথ্য, কিন্তু কফ-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে উহাই অপথ্য। বর্ষাকালের জ্বরে যেখানে মসুরীর যুস ব্যবস্থা করা যায়, গ্রীষ্মকালে সেস্থলে উক্তপথ্যে রোগীর দাহ ও তদানুসঙ্গিক উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে, সুতরাং পথ্যাপথ্যের বিচার চিকিৎসকের বিবেচনা-শক্তির উপর নির্ভর করে।

যাহা হউক ভূমিকা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা কাজের কথা বলিব। প্রথমেই জ্বরের কথা বলা যাউক। কারণ বঙ্গদেশের ব্যাধি সমূহের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বপ্রধান, জ্বর একটী সাধারণ কথা, সর্দ্দি জ্বর, বাতজ্বর, বাতশ্লেষ্মা-ক্ষেত্রের জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষম জ্বর ইত্যাদি সমস্তই জ্বরপর্য্যায় ভুক্ত, ইহার মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু ম্যালে-রিয়া বিষ সম্ভূত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে চারি কোটী। ইহার মধ্যে আড়াই কোটীর ও উপর লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকে এবং প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কি ভীষণ অবস্থা, একবার চিন্তা করিবার বিষয়!

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং"। জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘনই একমাত্র পথ্য। অপক্ক রসযুক্ত বায়ুপিত্তকফ—সামদোষ বলিয়া, জ্বরের প্রথম অবস্থায় অপক্ক রসে দেহ পূর্ণ থাকে, অগ্নিমান্দ্যই ইহার প্রধান লক্ষণ। জিহ্বা অত্যন্ত ক্লেদাবৃত হয়, মুখ দিয়া জল উঠে, গা বমি বমি করে, সমস্ত শরীর ভার বোধ হয়। মুখে বিস্বাদ এবং অরুচি হয়। তন্দ্রা ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দেহস্থ রস পরিপাক না পায় এবং এই সমস্ত উপসর্গের প্রখরতা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পথ্যাভাবে রোগীর হার্টফেলের (Heart fail) আশঙ্কা করা নিতান্ত অন্যায়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া একদিন কিম্বা দুইদিন উপবাস অথবা অত্যন্ত লঘু পথ্য দিলে জ্বরের বেগ কমিয়া আইসে, জিহ্বা পরিস্কৃত হয়, শরীরের জড়তাভাব দূর হয় এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষুধার উদ্রেক হইতে থাকে, এই সময়ে অল্পে অল্পে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আমেরিকাস্থ চিকাগো হেরিং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হোমিওপ্যাথিতে জ্বর চিকিৎসার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার ডাক্তার এইচ, সি, এলেন এম ডি, তাঁহার পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—

Pure water adlibitum is the best and safest died for the fever patient, nntil the tongue is clear the appetite--nature's call for food —returns, and the pulse and temperature nearly normal. The but results are generally obtained by hot water if it can be taken; if luckewarm, it often nanscation.

যতক্ষণ জিহ্বা পরিষ্কার না হয়, ক্ষুধা ফিরিয়া না আসে, নাড়ী এবং গাত্র তাপ প্রায় স্বাভাবিক না হয়, ততক্ষণ জ্বর রোগীর বিশুদ্ধ জলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ পথ্য। খুব গরম জল ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়, অল্প গরম জলে রোগীর গা বমি বমি করিতে পারে।

"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" হইলেও এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে, সর্ব্বস্থলে উপবাস বিধেয় নহে। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং গর্ভিণীর পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্নও বায়ু প্রধান, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাতুর, ভ্রমি (মাথাঘোরা) এবং দুঃখ ও শোকযুক্ত ব্যক্তিকে উপবাস করাইবে না। কৃমি গ্রস্ত বালকদের খালিপেটে নানারূপ উপসর্গ হইতে দেখা যায়।

রোগী যাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উপবাস এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ যে আরোগ্যের জন্যই চিকিৎসা, সেই আরোগ্যের একমাত্র আশ্রয়ই বল, বল ভিন্ন রোগীর আরোগ্য লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

সামান্য, সর্দ্দি জ্বরে চিড়া ভাজা, খৈ, সেই সঙ্গে দু এক খানি বাতাসা, মুড়ি দেওয়া যায়,

গরম মুড়ি গুঁড়া করিয়া লইলে বেশ লঘুপথ্য হয়। মুড়ির গুঁড়া অল্প জ্বরের মধ্যেও দেওয়া যাইতে পারে। কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, বেদানা, পানিফল, খেজুর প্রভৃতি এক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বরের প্রখর অবস্থায় চিড়াভাজা, পাউরুটী, খই ইত্যাদি পথ্য রূপে দেওয়া উচিত নহে, এরূপ স্থলে তরল পথ্যই ব্যবস্থা, অনেকে দুধ সাগু বা দুধ বার্লি দিয়া থাকেন, উহাত অত্যন্ত অন্যায়। জ্বরে পরিপাক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়, পাকস্থলীর এতদূর বৈকল্য ঘটে যে, দুগ্ধ পরিপাক করিবার ক্ষমতা তাহার মোটেই থাকে না, এমতাবস্থায় দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলে পাকস্থলীর ক্রিয়া অধিক খারাপ হইয়া উপসর্গ সমস্ত বৃদ্ধি পাইবে, জ্বর ও বাড়িয়া যাইবে।

অবস্থা ভেদে জলবার্লি, জল এরারুট, জল সাগু জ্বরের প্রথম অবস্থায় উত্তম পথ্য। এই সমস্ত পথ্য অনেকেই উত্তম রূপে পাক করিতে জানেন না, সুতরাং ইহা মোটেই সুস্বাদু হয় না। মুখের কাছে লইয়া রোগীর যতই আপত্তি করে গৃহস্থ ততই তাহাকে বুঝাইয়া থাকে (যেমন তিক্ত কবিরাজী পাচন সেবন কালে হয়) "নাকটি টিপিয়া কোনরূপে এক ঢোক গিলিয়া ফেল, নতুবা ঔষধে গুণ করিবে কেন?" বারংবার অনুরোধে রোগীও অনিচ্ছাসত্বে এই ভাবে পথ্য গ্রহণ করিবার প্রয়াস পায়, ফলে; ইহাতে পথ্য জনিত উপকারের স্থলে অপকারই সাধিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ দেহ অপক্ক রসে পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ পথ্য না দেওয়াই উচিত। পথ্য প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইলে সে পথ্য যাহাতে সুস্বাদু হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বার্লি উত্তমরূপে সিদ্ধ করা হয় না বলিয়া উহাতে একরূপ কাঁচা গন্ধ থাকিয়া যায়, সেই গন্ধে রোগীর আপত্তি উপস্থিত হয়। এক ছটাক বার্লি দেড় পোয়া জলে গুলিয়া তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া ক্ষীণ জালে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন একপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে তখন নামাইয়া লইলেই বার্লি প্রস্তুত হইল, লবণসহ সিদ্ধ করিলে উহার কাঁচা গন্ধ থাকে না, উপরন্তু নামাইবার পূর্ব্বে একটু মিছরি দিয়া লইলে আস্বাদ আরও ভাল হয়। খাইবার সময়ে রোগীর ইচ্ছানুসারে কচি কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া খাওয়া যাইতে পারে। বার্লি গরম থাকিতে থাকিতে দুই একটী এলাইচের দানা বা একটু দারুচিনি মিশাইয়া লইলে খাইতে বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না। তবে যাহারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হয়, তাহাদের পথ্য শেষোক্ত প্রকারে সুবাসিত করিবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। বার্লি, সাগু ইত্যাদি রাঁধিয়া ৫।৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যাইতে পারে, পুনরায় খাইবার সময় অল্প গরম করিয়া লইলেই হইল। যেখানে দুধ-বার্লি ব্যবস্থা, সেখানে দুধ বা চিনি, মিছরি মিশাইয়া রাখা নিষিদ্ধ, লবণ দিয়া পাক করা সাগুবার্লিতেও দুধ মিশ্রিত করা উচিত নহে।

সাগুও ঐ ভাবে পাক করিতে হয়। কিছু সময় পর্য্যন্ত সাগু ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আজকাল খাঁটি সাগু বাজারে পাওয়া যায় না, কেশুরাদানা-সাগু বলিয়া বিক্রয় করে, উহাতে সাগুর উপকারিতা কিছু মাত্র

দেখা যায় না, বরং অনেক সময় উহা পেট খারাপ করে।

ইদানীং বিলাতী নানাবিধ ফুড্, বার্লি, এরারুট ইত্যাদিতে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, এজন্য কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশে প্রস্তুত পথ্য গুলি বিলাতীর সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার বিষয়।

অনেক চিকিৎসক বলেন, রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লির ন্যায় দেশী বার্লি পরিষ্কাররূপে প্রস্তুত হয় না, সেজন্য রবিনসনের বার্লি রোগীর পথ্য এবং শিশুর খাদ্য রূপে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মসুরীর যূষ শাস্ত্রসম্মত একটী উত্তম বলকারী পথ্য। আস্ত মসুরী সুসিদ্ধ করিয়া (অবস্থা বিশেষে তাহাতে খৈ দেওয়া যাইতে পারে) উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে যে কাথ বাহির হইবে, তাহা সামান্য ধ'নে বাটা, লবণ ও তেজপাতা দিয়া সম্বরা দিয়া লইলে উত্তম পথ্য প্রস্তুত হইল। মসুরী সিদ্ধকালে উহার ফেনা উঠাইয়া ফেলিতে হয়, পুরাকালে এই পথ্য বহু পরিমাণেই ব্যবহৃত হইত, এখনও বৃদ্ধগণ ইহাকে 'আহার ঔষধ, দুইই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অপক্ক রসকে পরিপাক করিতে মসুরের অদ্ভুত ক্ষমতা, আয়ুর্ব্বেদে মসুরের যূষ ধারক এবং জরাতিসারে বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, মসুর সিদ্ধ জল এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মসুরের যূষ আমরা অতি-সারে ব্যবহার করি কই?

শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির জ্বরে বিশেষতঃ বর্ষাকালীন জ্বরে, যেস্থান দেহ, অপক্ক রসে পূর্ণ, মুখ বিস্বাদ যুক্ত, শরীরে ভার বোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি যাহার উপসর্গ, সেস্থলে মসুরের যূষ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিতে এবং গ্রীষ্মকালীন জ্বরে মসুরের যূষ দাহ এবং তদানুষঙ্গিক উপসর্গ বৃদ্ধি করিতে পারে, যে স্থলে মসুরের যূষ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তথায় উহার বদলে কাঁচা মুগের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মুগের যূষ পেটের পীড়ায় নিষিদ্ধ।

খৈমণ্ড জ্বরে আর একটী সুপথ্য। টাট্‌কা (কাঠখোলায় ভাজা অর্থাৎ বিনা বালি সংযোগে যাহা ভাজা হয়) খৈ গরম জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে ভিজিয়া গেলে চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়, জলে সিদ্ধ করিয়াও মণ্ড প্রস্তুত করা যায়। খৈ মণ্ড রেচক, সুতরাং উদরাময়ে দেওয়া উচিত নহে, অবস্থানুসারে দুগ্ধ, চিনি, মিছরী বা লবণ ও লেবু সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

তরুণ জ্বরে প্রথম দুই চারি দিনের পর হইতে যখন জ্বরবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে, রোগীর কোষ্ঠ সাফ হয়, জিহ্বা পরিষ্কার হয় এবং রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন হইতে দুগ্ধ, (তপ্ত বার্লি ইত্যাদির সহিত) প্রয়োগ করা উচিত। দীর্ঘকালস্থায়ী রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরে রোগীর বল রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অহিফেনসেবী এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের নিতান্ত আবশ্যক না হইলে দুগ্ধ বন্ধ করিওনা। শিশুদের দুগ্ধ সহ্য না হইলে চূণের জল অথবা সোডামিশ্রিত করিয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

রেমিটেণ্ট এবং টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় বিদ্যমান না থাকিলে উত্তম সাগু এবং বার্লির সহিত যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। পথ্য নিয়মমত ৩।৪ ঘণ্টা অথবা অবস্থা বিশেষে ১।২ ঘণ্টা অন্তর অল্প পরিমাণে দিতে হয়। পথ্য পরিপাকের জন্য রোগীকে উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। সর্ব্বদা এক প্রকারের পথ্যে রোগীর অরুচি জন্মিতে পারে, সুতরাং সুপক্ক ডালিম, বেদানা, অথবা আঙ্গুররস মধ্যে মধ্যে রোগীকে দেওয়া উচিত। ফল স্বভাবতই রেচক, সুতরাং উদরাময় বর্ত্তমানে ফল ব্যবহার না করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ডালিম, বেদানা রেচক নহে, বরং উহা ধারক, ইহা সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যেখানে উদরাময় বর্ত্তমান, সেস্থলে এরারুট উত্তম পথ্য। বাজারের এরারুটে নানাবিধ কৃত্রিমতা দোষ থাকে আশঙ্কা করিয়া আমরা প্লাসমন এরারুট ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের দেশে শটি হইতে পালো প্রস্তুত হয়। উদরাময়ে ইহাও সুপথ্য। কৃমিগ্রস্থ শিশুদের পক্ষে পালো বিশেষ উপকারী। কিন্তু প্রস্তুতকারীগণ পালো প্রস্তুত সময়ে উহার বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন বলিয়া মনে হয় না, তাহার ফলে অনেক ধূলিকণা উহার মধ্যে থাকিয়া যায়। রোগীর পক্ষে ঐরূপ পালো বিশেষ অপকারী। তবে অনেকে ইহা নির্দ্দোষরূপে ঘরে প্রস্তুত করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। উদরাময়ে পূর্ব্বে যবের মণ্ড ব্যবহৃত হইত। ইহা উদর ভঙ্গ রোগীর উত্তম পথ্য। যব হইতে বার্লি প্রস্তুত হয়। বার্লি ইত্যাদির চলন হওয়াতে যবের কথা অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

উদরাময়ে গাভীদুগ্ধ অপকারী। যেখানে দুগ্ধ দেওয়া যায় না, অথচ রোগীর বল রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, সেস্থলে অনেকে হর্‌লিক্‌স মিল্‌ক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা বিলাতে প্রস্তুত জমাট দুগ্ধ মাত্র। কেহ কেহ ইহার বিশেষ উপকারিতা স্বীকার করেন না। যাহাহউক অন্য কোন পথ্যের ব্যবস্থা যেখানে হয় না, সেস্থলে ইহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন কোন রোগীর ইহা রীতিমত পরিপাক হয় না, সে ক্ষেত্রে পালো, যবের মণ্ড ইত্যাদি দেশী পথ্যের শরণ লইলে ভাল হয়। অনেকে স্যানাটোজেনকে অধিকতর উপকারী বলিয়া স্বীকার করেন।

ছানার জল ধারক। সুতরাং উহাতে পুষ্টিকারিতাশক্তি না থাকিলেও উদর ভঙ্গে (বিশেষতঃ যেস্থলে পেটফাঁপা বর্ত্তমান) ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্য পথ্যের মাঝে মাঝে ইহা প্রয়োগ করা উচিত। অত্যুষ্ণ দুগ্ধ একটী কাচের বা পাথরের পাত্রে রাখিয়া তাহাতে সামান্য কাগজী বা পাতি লেবুর রস মিশাইলে ছানা কাটিয়া যাইবে, ঐ জল ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে, ছানার জল পরিষ্কার কাঁচবর্ণের হইবে। দুধের অংশ থাকিলে উহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে রোগীর অপকার সাধনই করিবে। লেবুর রস প্রয়োজনাধিক হইলে ছানার জল টক্ হইয়া যায়, উহা রোগীর পক্ষে অপকারী। লেবুর রসে প্রস্তুত ছানার জল পরিপাকের সহায়তা

করিয়া রোগীর উপকার সাধন করে। কেহ কেহ ফিটকিরি দিয়া ছানার জল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ফিট্‌কিরি অত্যন্ত ধারক, সুতরাং উহা হঠাৎ রোগীর দাস্ত বন্ধ করিয়া দিতে পারে, লেবু পাওয়া না গেলে উহার পরিবর্ত্তে Citric asid সাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য।

(কবিরাজ শ্রী নীলকান্ত রায় কবিরত্ন)

—— :o: ——

চক্র। যাঁহারা বহুদিন পূর্ব্বে নাড়ী ধরিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধাদির হ্যনাতিরিক্ত, অনুলোম বিলোম দ্বারা রোগ, মৃত্যু ও আরোগ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন, অভিসম্পাত-অভিচারাদি ও যে মৃত্যুর কারণ ইহা যাঁহাদের মস্তিষ্ক-নির্গত তাঁহাদের সঙ্গে কি অন্য কাহারও তুলনা হয়?

সুরেন। হানিমানের সঙ্গে কি হয় না। তিনি যে চিকিৎসার একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

চক্রপাণি। না।

সুরেন। কেন?

চক্র। জান ত সৃষ্টিটি কি? হানিমান একজন বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি দেখিলেন লোকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, দেবতাকে মান্য করে, ভূত পিশাচকে ভয় করে, অথচ ইহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু এ বিশ্বাসের একটা ফল যে লাভ না হয় এ বলা যায় না। 'বিশ্বাস থাকিলে তাহার ফল আছে' এই প্রমান সাহায্যে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, চিকিৎসায় বিশ্বাস দ্বারা অবশ্যই চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাইবে, বস্তুতও চিকিৎসার কোন বিশেষ ফল নাই; নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে কেবল মাত্র স্পীরিটেরই ক্রিয়া দেখা যায়।

সুরেন অবাক হইয়া চক্রপাণির মুখের দিক কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, পরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, আপনার এ কেমন বিশ্বাস, যাঁহার গবেষণার, যাঁহার অলৌকিকতায়, যাঁহার কৃতকার্য্যে আজ জগৎ স্তম্ভিত, আপনি তাঁহাকে একেবারে অস্বীকার করিতেছেন, বিশ্ববাসীকে ভ্রান্ত মূঢ় বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, একি ঠিক? বিশ্ববাসী সবাই কি ভ্রান্ত? না সবাই কি জড়? না এক জন ভ্রান্ত, একজন মুগ্ধ?

চক্রপাণি। সবাই বলি কেন? যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা কি উহাতে মুগ্ধ না উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান?

সুরেন। কেন বিশ্বাস করিবেন না? যদি আয়ুর্ব্বেদ, অ্যালোপ্যাথিকাদি বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে উহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না কেন? ইহা কি চিকিৎসা নয়? ইহাতে কি রোগ নাশের কোন উপায় নির্ণয় করা হয় নাই?

চক্রপাণি। হাঁ ইহাতে রোগ নাশের ঔষধ নির্ণয় করা হইয়াছেন, কিন্তু তাহা পরামর্শের বিরুদ্ধ।

সুরেন। কি রকম?

চক্রপাণি। প্রথমতঃ দেখ ঔষধ এত সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম অংশে বিভাজিত যে, তাহার ক্রিয়া শরীরের উপর প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

সুরেন। কেন?

চক্র। ঐ দ্রব্যের বিশেষ কোন স্বাদ থাকেনা বলিয়া উহা ক্রিয়াশূন্য, কেবল মাত্র স্পিরিটের আস্বাদই প্রত্যক্ষ হয় সুতরাং ঐ স্পিরিটের গুণ মাত্র ফলিয়া থাকে।

সুরেন। আস্বাদ সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না, কারণ বালকগণকে অনেক সময় কুইনাইনাদি তিক্তদ্রব্যও মিষ্টাদি দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া ঔষধ সেবন করান হয়, কিন্তু তাহাতে ঐ সব দ্রব্যের ক্রিয়ার গুণের কোন লাঘব দেখা যায় না। অতএব স্পীরিটের আস্বাদ বাহুল্য মাত্র। স্পীরিটের ক্রিয়া হইবে ইহার মানে কি?

চক্র। বেশ প্রমাণ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সেই মিষ্ট আবরণ উদ্ঘাটন করিলে তিক্ত আস্বাদটী পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই উহার এক রসের জন্য ঐ এক ক্রিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মাদার টিংচার বা মূল বস্তুতে সে আস্বাদ আছে, তাহার সূক্ষ্মাংশ ঐ স্পিরিটে নিশ্চয় নিহিত আছে, যাহার স্থূলাংশে ক্রিয়া হইবে, তাহার কি সূক্ষ্মাংশে ক্রিয়া হইবে না? স্বীকার করি সূক্ষ্মাংশে তাহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইবে, কিন্তু সে ক্রিয়া যে ফলবতী হইবে ইহা স্বীকার করিনা।

সুরেন। কিছু মাত্রও নয়?

চক্র। না। কেন তা শুন। জল অগ্নি নির্ব্বাণ করে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে বিন্দুমাত্র জল কি প্রবেশ করিতে পারে? পারিলেও কি নির্ব্বাণ করিতে পারে? পড়িবা মাত্র সে উড়িয়া যায়, বা শুষিয়া যায়। কেন ক্রিয়া করিতে পারেনা? ওরূপ অগ্নিকুণ্ডে অমনি ভাবে শত শত মোন জল সিঞ্চন করিলেও কোন ফল ফলে না, কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, ব্যাধি প্রধান্যানুযায়ী ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট না হইলে সে ঔষধ অবশ্য নিষ্ফল হইবে। এ প্রমাণ হোমিও-প্যাথেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, রোগ পুরাতন হইলে ঔষধের মাত্রা কম হইবে, যথা নূতন রোগে অল্প ডাইলুসন ব্যবহার করিবে। অনেক স্থলে ব্যাধির পুরাতনাবস্থায় দোষের মাত্রা যে বাড়িয়া যায় ইহা কি মিথ্যা? অগ্নিমান্দ্য, যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস ইত্যাদি বহুবিধ রোগ পুরাতন হইলে তাহার শক্তি প্রবল হইয়া থাকে।

সুরেন। নিশ্চয়। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ডাইলুসন বেশী হইলে তাহার শক্তি বেশী হইবে। আয়ুর্ব্বেদও তাহা স্বীকার করিতেছেন, যথা।—মূলধাতু অপেক্ষা ভস্মের গুণ অধিক, শত পুটিত অপেক্ষা

সহস্র পুটিতে ক্রিয়া বেশী। অর্থাৎ মূলবস্তু অপেক্ষা বিভাজিত বস্তুর গুণ বেশী।

চক্র। সেটা কেন তাহা জান? শরীরে মিলাইবার জন্য, পরিমাণ কমাইবার জন্য নয়। শত পুটিত লৌহের মাত্রা একবড়ি হইলে যে সহস্র পুটিতে মাত্রা তদপেক্ষা কম হইবে, তাহা নয়, ব্যাধির শক্তি যেরূপ, ঔষধের মাত্রা তদ্রূপ হইলে তবে ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদ যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম, বস্ত্র হইতে অর্থাৎ বস্ত্র ছাঁকিলে যে লৌহচূর্ণ সকল স্থলে হংসের ন্যায় হাল্কা ভাবে ভাসিয়া বেড়াইবে তাহাই মৃত। এইরূপ লৌহই ঔষধের যোগ্য। শত পুটিত বা সহস্র পুটিত তাহা বিচার করিবার দরকার হয় না। বঙ্গ সম্বন্ধেও ঐরূপ বলিয়াছেন, "যাবৎ ভস্মের মত বর্ণ ও স্বাদ ও হাল্কা না হইবে তাবৎ মর্দ্দন করিবে"। তাম্র সম্বন্ধেও "যাবৎ উহার ভ্রান্তি দোষ না যায় তাবৎ উহাকে পুট দিবে"। অভ্র সম্বন্ধে নিশ্চন্দ্র মারিতাভ্রে রস, বীর্য্য, তনু, দৃঢ় হয়, জরা বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু নাশ হয়। স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি মুক্তাদির এরূপ প্রমাণ নাই বলিয়া উহাদিগকে নিরূপিত পুটে পাক করিতে হইবে। অনেকে ধাতুর শত পুট, সহস্র পুট দেখিয়া ডাইল্যুসনের সঙ্গে তুলনা করেন, কিন্তু এ তুলনা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া সুরেন চিন্তা করিতে লাগিল। চক্রপাণি বলিলেন, আর একটী কথারও কোনও যুক্তি পাই না।

সুরেন চিন্তাত্যাগ করিয়া বলিল,—কি?

চক্রপাণি। সুস্থাবস্থায় যাহার কোন ক্রিয়া দেখা যায়না, তাহার অসুস্থাবস্থায় যে ক্রিয়া হইবে এ কিরূপ যুক্তি?

সুরেন। সেকথা পরে হইবে আগে মাত্রার বিষয় ঠিক হউক। আয়ুর্ব্বেদ ঔষধের মাত্রা একরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

চক্র। কই?

সুরেন। মৃত্যুঞ্জয় রসের মাত্রা মুগের মত, লক্ষ্মীবিলাসের মাত্রা দু'রতি, মকরধ্বজের মাত্রা এক রতি ইত্যাদি। রোগের ন্যূনাধিক্য বশতঃ এসব ঔষধের মাত্রায় কি হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চক্র। কেন হইবেনা? আয়ুর্ব্বেদত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চিকিৎসক ইচ্ছামত নিরূপিত মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। মাত্রা কেন জান? কোন শক্তিকে বাধা-দিতে হইলে তদপেক্ষা বেশী শক্তি প্রয়োগ না করিলে উহাকে কখনই বাধা দেওয়া যায় না, তাত জানই। আবার কেহ কেহ শাস্ত্রের নিরূপিত মাত্রা বার বার দিয়া ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তবে শাস্ত্রে মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন, তা তো জানই, এমাত্রায় শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা কোনরূপ ক্ষতিকর নয়।

সুরেন। আর একটী কি বলিতে-ছিলেন?

চক্র। হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়াহীন, পরোক্ষে যে সে অত বড় ক্রিয়াবান হইবে এ ধারণা মনে যেন স্থান পাইতে চায় না।

সুরেন। আয়ুর্ব্বেদের সব ঔষধ কি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ?

চক্র। তা বই কি? জয়পাল সেবন করিলে দাস্ত হয়, কস্তুরী সেবনে গরম হয়,

হিমসাগরে ঠাণ্ডা হয়, যবক্ষারে প্রস্রাব বেশী হয়, তাম্র বমনকর, লৌহজ্বর নাশক, রক্তরোধক ইত্যাদি, এ সকলের ফলতো হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্র। ও গুলিত দ্রব্য, যৌগিক ঔষধ তো নয়!

চক্র। দ্রব্যগুলির ক্রিয়া যেরূপ, যৌগিক ঔষধের ক্রিয়া সেইমতইত হইবে বিশেষতঃ উহার একটা প্রভাব বেশী থাকিবে। যেমন কস্তুরী ঘটিত ঔষধে গরম বোধ হয়, জয়পাল ঘটিত ঔষধে দাস্ত বেশী হয়, ইহার কোনটা না ফলিয়া থাকে? এছাড়া একটা অতিরিক্ত প্রভাব হইয়া থাকে, যথা—লৌহ ও তাম্র একটী ঔষধে আছে, উহার প্রভাব হইতেছে বাতশ্লৈষ্মিক অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ, জ্বর নাশক। লৌহের স্নিগ্ধতার সঙ্গে তাম্রের উগ্রতা মিশ্রিত হইয়া ঐ একটী নূতন গুণের শক্তি উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যেকের গুণ চাপিয়া রাখিয়া একটি নূতন গুণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লৌহের স্নিগ্ধতায় কফ যেটুকু বৃদ্ধি পাইবে, তাম্রের উগ্রতায় তাহা নষ্ট হইল। লৌহ ও তাম্র উভয়ের মিশ্রিত গুণে পুনরায় উগ্রতা দোষ আর জন্মিতে পারিবে না; বিশেষতঃ জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, ক্ষয়, হৃচ্ছূল, আমদোষ প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইবে। হোমিও-প্যাথ এই সংমিলন বা রসায়ন স্বীকার করেন নাই।

সুরেন্দ্র। সব ঔষধের ক্রিয়া কি প্রত্যক্ষ বোধ হয়?

চক্র। সুস্থাবস্থায় প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ শরীরের একটা পরিবর্ত্তন অবস্থা আসিয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথিকের এরূপ কোন ক্রিয়া দেখাইবার নাই বলিয়া যেখানে আরোগ্যাবস্থা দেখা যায়, সেখানে স্বাভাবিক, আর অনারোগ্য অবস্থা দেখিলে ঔষধের নিষ্ক্রিয়তাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য মতে রোগ আরোগ্য না হইলে তাহা কেবল চিকিৎসকেরই অজ্ঞতা বুঝিতে হইবে। ইহার কি উত্তর? সুরেন্দ্র তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।

(২)

এ সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য সুরেন তাহার অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে দুদিন ধরিয়া অনেক তর্ক ও পরামর্শ করিল। শুনিয়া অনেকেই অবাক হইয়া গেল। কেহ বলিল, ও কথার আর মীমাংসা কি? হানিমান যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনই ভুল হইতে পারেনা। কেহ বলিল উহার কি ভুল কখনও সম্ভব হয়? জার্ম্মানবাসীগণ এখন তাঁর পিত্তলের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতেছেন। কেহ বলিল, জার্ম্মাণ-আমেরিকানগণ যখন তাঁহার মতের পরিপোষক, তখন কি উহাতে ভুল আছে?

পরদিন সুবিধামত সুরেন চক্রপাণিকে পূর্ব্বোক্ত মিমাংসা জ্ঞাপন করিল, চক্রপাণি বলিলেন,—ঔষধে ছাড়াও যে রোগ আরোগ্য হয় তাহা স্বীকার কর?

সুরেন আশ্চর্য্য ভাবে বলিল, কিরকম?

চক্রপাণি বলিলেন, পেট ফাঁপিয়া কাহার কাহার কোনদিন অজীর্ণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় কেহ মিশ্রী বা চিনির সরবৎ, কেহ লেবুর রস, কেহ ঘোল, কেহ বা কোন ঔষধ সেবন করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হয়, আর কেহবা কিছু না খাইয়া শুধু

দিবানিদ্রা দ্বারা, কেহবা প্রাতঃভ্রমণ দ্বারা, স্নানাহারা, আরো গ্যালাভ করিয়া থাকে। যোগাযোগ্য অতএব যে শুধু ঔষধ দ্বারা হয় এরূপ নহে। পথ্য দ্বারাও হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথগণ এইজন্য ঐ দুটীর উপর নির্ভর বেশী করিয়া থাকেন ইহাই তো আমার মনে হয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত ও তৈলাদি পাকের প্রকৃত বিধি।

(কবিরাজ শ্রীদ্বারকা নাথ সেন কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ)

—:•:—

কলিকাতায় ব্যবসায় করিতে আসিয়া দেখিতেছি; কবিরাজী তৈলের বর্ণ ও গন্ধ মনোমুগ্ধকর নহে, উপরন্তু সাধারণ তৈলাদি অপেক্ষাও দুর্গন্ধযুক্ত, সেই কারণে বড়লোকেরা উপহাস করিয়া বলেন যে, "অন্যান্য ঔষধ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা করুন, নিতান্ত ফল না হয় আপনাদের এসেন্স ব্যবহার করিব"।

"দুগন্ধং বিনিহত্য তৈল মরুণং সদগন্ধ মাকুর্ব্বতে" ইহা দ্বারা তৈলের মূর্চ্ছা ক্রিয়ায় কোন ফল নাই, না তৈলে যে মূর্চ্ছা পাক-সম্যকরূপে হইয়াছে তাহারই লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? মূর্চ্ছা ক্রিয়ার ফল হইতেছে তৈলের শোধন। যেমন স্বর্ণাদিতে তাহাদের স্বাভাবিক দোষ দূরীকরণার্থে তৈল-তক্রাদির দ্বারা উহার সংশোধন ক্রিয়া করিতে হয়, সেই-রূপ সমস্ত তৈলাদি পাকের পূর্ব্বেই উহার স্বভাবতঃ দোষ নষ্ট করিবার জন্য মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা উহার সংশোধন আবশ্যক। নতুবা সংশোধনাদি না করিয়া স্বর্ণাদির মারণ ক্রিয়া করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিলে সুফল না হইয়া কুফলই উৎপাদন করে, এ অবস্থায় প্রাচীন বৈদ্যদিগকে স্তাবক না বলিলে কি ভাল হইত না? সংগ্রহে আগে অথ বাতারহ তৈলানাং বিশেষ মূর্চ্ছা বিধিঃ" অরাধি তৎ তৎ রোগে ফল বিশেষের জন্য মূর্চ্ছাপাক ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

প্রাচীন বৈদ্যেরা শোধন না করিয়া প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিতেন না। চক্রদত্তে সেই মুখশুদ্ধি বচশুদ্ধির নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইত না। যাহারা প্রাচীন কুলীন বৈদ্য—কুলপরম্পরাক্রমে যাঁহারা চিকিৎসা বৃত্তি করিয়াই আসিতেছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে প্রাচীন পরিভাষা ও সার সংগ্রহাদি গ্রন্থ আছে, ঐ সকল গ্রন্থে তৈলের মূর্চ্ছাপাক বিধির শেষে এই ফলোক্তি আছে।

"সর্ব্বেষাং তৈলপাকানাং শোধিনাং পরি-কীর্ত্তিতং"

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তৈলের শোধনই মূর্চ্ছাক্রিয়ার ফল।

প্রবন্ধ লেখক কটুতেলে বা ঘৃতে মূর্চ্ছা পাকের ফলে আম দোষ নষ্ট হয়, এই স্পষ্ট উক্তি দেখিয়াও উহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিতে বলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের পত্রই প্রমাণ বলিয়া ঐ উক্তির উপর সন্দেহ করিয়াছেন, পত্র প্রমাণ করিয়া প্রবন্ধ লেখকই প্রাচীন পরিভাষাকারের উপর সন্দেহ করুন, কিন্তু আর কোন ব্যক্তি প্রাচীন পরিভাষা—যাহার উপর আস্থা করিয়া এযাবৎকাল সমস্ত চিকিৎসক চলিয়া আসিতেছেন, সেই প্রাচীন বৈদ্য অপেক্ষা পূজ্যপাদ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কথা শিরোধার্য্য করিবেন না। আর কথায় কথায় বিধানের কথা আমরা জিজ্ঞাসা করি,তৈল-তক্র-গোমূত্র-কুলত্থের কাথে স্বর্ণাদি একবার গরম করিয়া ভিজাইলে তাহাতে কি ভাবে দোষ সংশোধন হয়, কিরূপে দোষটী চলিয়া যায়, ইহা কি নিজে কখনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখিয়াছেন? শুনিয়াছি আজ কালকার কোনও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মকরধ্বজে স্বর্ণ না দিলেও সমান ফল হয়, যেহেতু স্বর্ণের কোন অংশ মকরধ্বজে মিশে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় সেই মতের পরিপোষক, না আজকালের বিজ্ঞান দ্বারা স্বর্ণাদি মিশ্রণ করিয়া মকরধ্বজ করিলে তাহার যে কোন সূক্ষ্মাংশ উহাতে মিশ্রিত হয় বা তাহাতে কি বিশেষ ফল হয়, ইহা পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা স্বীকার করেন? আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা সকল দ্রব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারি না বলিয়া কি প্রাচীনগণও পারিতেন না আমরা বলিব। আমরা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া সুশ্রুতের

প্রত্যক্ষ লক্ষণকণাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৈষধীর্হেতুভির্ধীমান পরীক্ষেত কদাচন-
সহস্রেনাপি হেতুণাং নাম্বষ্ঠাদি বিরেচয়েৎ
তস্মাৎ তিষ্ঠেত্তু মতিমানাগমে নতু হেতুষু॥

এই বাক্যই শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

তা'রপর গন্ধপাকের আলোচনা করা যাউক। গন্ধ পাকের দ্বারাও তৈলে মনোহর গন্ধ হয় না তাহা যাঁহারা কবিরাজী তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। সম্প্রতি গন্ধপাকের মূলে কোন শাস্ত্র আছে কি না এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাচীন বৈদ্য মহাশয় "গন্ধ দ্রব্য মিদং প্রদেয় মখিলং শ্রীবিষ্ণু তৈলাদিষু' বলিয়া তাঁহাদের কল্পিত বাতব্যাধি অধিকারের সমস্ত তৈলেই গন্ধ দ্রব্য দ্বারা পাক করিতে বলিয়াছেন, বৈদ্য সম্প্রদায়ও যে সকল তৈল বায়ু নাশের জন্য ব্যবহার করেন, সেই সকল তৈলেই গন্ধ পাক দিয়া থাকেন। আজকাল যে সকল তৈল চিকিৎসক সমাজে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায়ই গন্ধ পাক ব্যবস্থাপক বৈদ্যদের দ্বারাই প্রচারিত। শ্রীবিষ্ণু তৈল "বিষ্ণুনা পরকীর্ত্তিতং" মহানারায়ণ তৈল, "নারায়ণেন বিহিতং"শ্রীগোপাল তৈল "অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং,' হউক, উহা চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। সম্প্রদায় ক্রমে ঐ সকল তৈল পাক বিধি স্মরণ রাখিয়া পরে গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন মানিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণু তৈলাদির ফলও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া যদি ইহাই মানিয়া লই, যে শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি তৈল বহু প্রাচীন, উহা চরকাদিতে না থাকিলেও আর্য্যগ্রন্থ হইতেই প্রাচীন

বৈদ্যেরা সংগ্রহ করিয়া ছিলেন ইহা না স্বীকার করিবার কারণ কি? গন্ধপাকে অন্যান্য ফলের সঙ্গে গন্ধ বৃদ্ধি হউক তাহাতে ক্ষতি কি? গন্ধ বৃদ্ধিরও একটা ফল আছে। যে সকল ঔষধে রোগীর অরুচি জন্মে, সে সকল ঔষধে ভাল না হইয়া রোগ বৃদ্ধিই হয়। সেই জন্য লোকের প্রকৃতি অনুসারে নানারূপ ঔষধ কল্পনা। গন্ধপাক দিয়া যদি দুর্গন্ধ নষ্ট হয় বা কিঞ্চিৎ সদ্‌গন্ধ হয় তাহা হইলে সে ঔষধ রোগীর উদ্বেজক হইবে না। উদ্বেজক না হইলে ফলও ভাল হইবে ইহাই কল্পনা করা উচিত। গন্ধ পাকের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, তাহা দেখিয়াই নীরব হইব। চরকে বলাতৈল বাতব্যাধি চিকিৎসিতাধ্যায়ে। যথা:—

বলা শতং গুড়ূচ্যাশ্চ পাদং রাস্নাষ্টভাগিকং
জলাঢক শতে পক্ত্বা দশ ভাগ স্থিতে রসে,
দধি মস্তিষু নির্য্যাস শুক্তৈ তৈলাঢ়কং সমৈঃ।
পচেৎ সাজপয়োঽর্দ্ধাংশৈঃ কল্কেরেভিঃ
পলোম্মিতৈঃ।
শঠী সরল দার্ব্বেলাং মঞ্জিষ্ঠা গুরু চন্দনৈঃ
পদ্মকাতিবিষা মুস্ত সূপ্যপর্ণি হরেণুভিঃ
যষ্ট্যাহ্ব সুরস ব্যাঘ্র নখর্ষভক জীবকৈঃ
পলাশ স্বরস কস্তূরী নলিকা জাতি কোষকৈঃ
পৃক্কা কুঙ্কুম শৈলেজ জাতি কটুকলাম্বুভিঃ
ত্বক্‌ কুন্দুরু কর্পূর তুরস্ক শ্রীনিবাসকৈঃ
লবঙ্গ নখ কক্কোল কুষ্ঠ মাংসী প্রিয়ঙ্গুভিঃ
স্থৌনেয় তগর ধ্যাম বচা মদনক প্লবৈঃ
সনাগকেশরৈঃ সিদ্ধে ক্ষিপেচ্চাত্রাবতারিতে
পত্র কল্কং ততঃ পূতং বিধিনা তৎ প্রয়োজয়েৎ

এই তৈলে সুগন্ধকর কল্কাদি দ্রব্যের দ্বারা পাকের পরও পুনঃ গন্ধ দ্রব্য (পত্র কল্ক) দ্বারা পাক করিবার বিধান আছে, ইহা দেখিয়াও গন্ধপাককে একেবারে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। চক্রদত্তে "মহারাজ প্রসারিণী তৈলের' পাক বিধান কালে কেবল গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা পাক নয়, তাহার বিশেষ শোধন করিয়া তদ্দ্বারা পাকের বিধান আছে। কেবল "মহারাজ প্রসারিণী'তে নয় ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা অপরাপর তৈলও প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চক্রদত্তে যে সকল ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল, এলাদি তৈল, অষ্টাদশ শতী প্রসারিণী তৈল আছে তাহার মোটামুটি দ্রব্য সকল লেখা থাকিলেও উহার পাক বিধি লেখা নাই। উহা বৃদ্ধ বৈদ্য পরম্পরার শিক্ষা করিতে হয়। চক্রদত্তের টীকাকারও সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, চিকিৎসক সমাজও তাই করেন। কেবল পুস্তক খুলিয়া দেখিলে চিকিৎসা কার্য্য চলে না, ইহাতে নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হইলে দীর্ঘকাল সুচিকিৎসকের নিকট থাকিয়া ঔষধ পাক, রোগের ব্যবস্থাদি হাতে কলমে শিখিতে হয়। এইজন্য দৃষ্টকর্ম্মা হওয়াই একটী বৈদ্যের প্রধান গুণ। শাস্ত্রের সংক্ষেপ ভাবে উক্তি অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহারই বিস্তারোক্তি করিয়াছেন মাত্র। এই বিশ্বাসে আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক অজ্ঞ বৈদ্যেরা সেই বৃদ্ধ বৈদ্যদিগকে বড়লোকের "মোসাহেব" না বলিয়া নিঃস্বার্থভাবে আর্ত্তের আশ্রয়দাতা, প্রাণরক্ষক, জগতের উপকারী বলিয়া শিষ্যের মত তাঁহাদের বাক্য অসন্দিগ্ধচিত্তে মাথায় ধারণ করে। এই ভাব যতদিন থাকিবে, যতদিন আমরা তাঁহাদের উপর নিজেদের বিদ্যা প্রকাশে কৃতিত্ব দেখাইতে না পারি,

ততদিন আয়ুর্ব্বেদ মাথা তুলিয়া সকল চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। আর যেদিন হইতে বৃদ্ধদিগের মতে অনাস্থা প্রকাশ করিতে শিখিব, সেইদিন হইতেই আয়ুর্ব্বেদকে ও দুরারোগ্য রোগে ধরিয়া তাহার জীবন ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইব।*

—

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী
এন, এ, এম, এস; এচ, এম, বি]

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে, বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব,—ভারতের গৌরব—জগতের গৌরব-সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর ইহ জগতে নাই। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ১১ই তারিখের রবিবার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পুরুষ সার আশুতোষ পাটনা সহরে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সারা ভারতে সার আশুতোষ কেবল মাত্র একজনই জন্মিয়াছিলেন। সার আশুতোষের তুলনা কাহারো সহিত হয় না। তাঁহার তুলনা করিতে হইলে বলিতে হইবে "তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

সার আশুতোষের অতুলনীয় কীর্ত্তি সমূহ আজ কয়েকদিন ধরিয়া প্রত্যেক সাময়িক পত্রেই বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিষয় বেশী কিছু বলিবার আমার নাই।

সকলেই জানেন তিনি একজন খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন—প্রকৃত বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার চালচলন সাজ সজ্জা সকল তাতেই একজন প্রকৃত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইত। সকলেই জানেন সার আশুতোষের মত বিদ্বান ভারতে আর একজনও নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

---

* এই প্রবন্ধ লেখক ঘৃত ও তৈলাদির পাক বিধি সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন আমরা এই মতেরই পরিপোষক। ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখনই ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পরও যে আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অন্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠান তাহা আমরা পত্রস্থ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই—তাহার কারণ তাহা না করিলে সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হয় না। ফল কথা আমাদের প্রতি কটাক্ষ করার জন্যই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধটী অযৌক্তিক জানিয়াও আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহা হউক বর্ত্তমান যুক্তি মূলক প্রবন্ধটী পড়িয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রম দূর হইলে আমরা সুখী হইব। আং সং

সত্যই বলিয়াছেন "তিনি উৎকৃষ্ট বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট বিচারপতি বলিলে তাঁহাকে খাট করা হয়, তিনি শিক্ষার অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, কিন্তু শুধু শিক্ষার নেতা বলিলে যাহা বুঝায় তিনি তাহা হইতে অনেক বড় ছিলেন, তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু সেদিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল দিকটা দেখা হইল না। তিনি ছিলেন একটা জাতকে গড়িয়া তুলিবার বিশ্বকর্ম্মা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সার আশুতোষের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ছিল, সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকেও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বাঙ্গালী বলিয়া এবং সেই বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা বলিয়া সার আশুতোষ গৌরব অনুভব করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, সে আজ বেশীদিনের কথা নহে, বোধ হয় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় মহাশয় "কার্ব্বঙ্কল" রোগে আক্রান্ত হন। আমি একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, তাঁহার আদেশে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে 'নায়ক' পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেছি, এমন সময় সার আশুতোষ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সকলেই উঠিয়া গেলেন। আমাকেও যাইবার জন্য দু'চারজন ইঙ্গিত করিলেন, আমাকে কিন্তু একটা লোভ পাইয়া বসিল। মন কেবলই বলিতে লাগিল,এতবড় একজন লোক এলেন, তাঁর পায়ের ধূলাটা নিয়ে যাবিনে? তাই আমি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না। সেইখানেই রহিয়া গেলাম, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম—তিনিও আমাকে বসিতে বলিলেন। আমার হাতে কাগজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কি কাগজ?" আমি বলিলাম 'নায়ক'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন 'আমার সম্বন্ধে বুঝি খুব গাল দিয়েছে'। তিনি বলিলেন"হাঁ প্রথমেই আপনার কথা।" বাস্তবিক সেইদিন প্রথমেই 'সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও তাহাতে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় লেখা বাহির হইয়াছিল। আশুবাবু এই কথা শুনিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'উহার গাল শুনিতে আমার বেশ লাগে'। সেই সময় নায়ক সম্পাদন করিতেন—স্বনামধন্য স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আমার জীবনের এই ঘটনা আজও যেন সম্মুখে দেখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে।

আশুবাবুর নিন্দা সুখ্যাতির বাহিরে ছিলেন। তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, এমন কি তাহার উপকার করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। আগামী বারে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩১। | ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

স্বপ্ন বিবৃতিঃ।

(কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ)

স্বপ্ন শব্দের প্রথম অর্থ নিদ্রা, অমর সিংহ বলেন "স্যান্নিদ্রা শয়নং স্বাপঃ স্বপ্নঃ সংবেশ ইত্যপি।" গ্রন্থাদিতেও "মুদং দিবা স্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্", "মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ", প্রভৃতি বহু স্থলে নিদ্রা অর্থেই স্বপ্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার দ্বিতীয় অর্থ নিদ্রাবস্থায় অনুভূত বিষয়াদি,

"ইত্যেতে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতি পঞ্চতাম্"

"স্বপ্নান্ পশ্যত্যেনেকধা" "স্বপ্নঃ সোঽল্পবলো-ভবেৎ"

ইত্যাদি চরক বচনে স্বপ্নকে সুপ্ত ব্যক্তির অনুভূত বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলেও আমার অদ্যকার বক্তব্য দ্বিতীয়ার্থ-বোধক স্বপ্নকে লইয়াই, কিন্তু উহা পূর্ব্বোল্লিখিত নিদ্রাব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া নিদ্রা সম্বন্ধেও আমাকে কিছু বলিতে হইবে। অতএব নিদ্রা কি? স্বপ্ন কি? স্বপ্নের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্পর্কের উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি বিষয় কয়টিকে লইয়াই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমাকে আজ আলোচনা করিতে হইবে। নিদ্রা তমোগুণ বহুল বলিয়াই সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ক্লান্ত মন যখন কর্ণ চক্ষুঃ প্রভৃতি শ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় হইতে সরাইয়া আনে এবং

(আয়ুর্ব্বেদ সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

নিজে তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয় মানব তখনই নিদ্রাগ্রস্ত হয় অথবা ঐ অবস্থাই মানবের নিদ্রিত অবস্থা। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

যদাতু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ
হৃদয়ং চেতনাস্থান মুক্তং সুশ্রুত! দেহিনাম্
তমোঽভিভূতে তস্মিংস্ত নিদ্রাবিশতি
দেহিনাম্।

ঐ সময় পরিচালক রজোগুণ ও প্রকাশক সত্ত্বগুণ মনকে পরিত্যাগ করে বলিয়াই মন আবরক তমোগুণের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, মহর্ষি পতঞ্জলি ঠিক এই কথাই তাঁহার "অভাব প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা" সূত্রে স্পষ্ট বলিতেছেন, এই স্থলে অভাব প্রত্যয় শব্দের অর্থ তমঃ অর্থাৎ রজঃসত্ত্বের অভাব, এই তমোকে অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয় করিয়াই নিদ্রার উৎপত্তি, অভাব প্রত্যয়ং তমঃ বলিয়াই ঐ স্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে "মেঢ্র মনঃ সংযোগো নিদ্রা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে. মেঢ্র শব্দে উপস্থ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়, নিদ্রাবস্থায় মনের আত্যন্তিকী তামসিকতা প্রকাশ করিবার জন্যই এখানে মেঢ্র শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, বাস্তবিক তমোগুণের দ্বারা মনের একান্ত অভিভূতি ভিন্ন এরূপ নিম্নগতি কখনই সম্ভবপর নহে, সুতরাং "তমোঽভিভূতে তস্মিংস্ত নিদ্রাবিশতি দেহিনাং" "তমঃ কফভ্যাং নিদ্রা", প্রভৃতি নিদ্রার আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্ত অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত অবিরোধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এখন দ্বিতীয়ার্থ প্রতিপাদক স্বপ্ন অর্থাৎ যাহাকে লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা তৎসম্বন্ধে বলিতেছি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটী ছাড়া দেহাবচ্ছিন্ন জীবের চতুর্থ কোন অবস্থা দর্শনকার স্বীকার করেন না, সুতরাং ইহাকে পূর্ব্বোক্ত নিদ্রার অন্তর্ভুক্ত করা ব্যতীত উপায় নাই, এখানে স্বপ্ন শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত নিদ্রা এবং সুষুপ্তি শব্দে স্থূলতঃ তাহার আতিশয্যকে বুঝায়। নিদ্রা এবং সুষুপ্তির সাধারণ ভেদ এই যে নিদ্রাবস্থায় মনের ক্রিয়া থাকায় সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" প্রভৃতি প্রকাশ করিতে গিয়া অনুভূত সুখের অবস্থা ও প্রকার বর্ণনা করিতে পারে কিন্তু সুষুপ্তির পর "কোনই দুঃখ ছিল না যেন পরমানন্দে ছিলাম" বলিতে পারে মাত্র, পরন্ত পূর্ব্বানুভূত আনন্দের প্রকার ব্যক্ত করিতে পারে না, তথায় আনন্দ যেন পুঞ্জীভূত, কারণ এই যে, সুষুপ্তির আনন্দ প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়; এইজন্যই উহাকে ঋষিগণ অবাঙ্-মনসগোচর ব্রহ্মানুভূতি অথবা নির্ব্বাণের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত স্বপ্ন কি তাহাই দেখিতে হইবে।

চক্ষুকর্ণাদি ও হস্তপদাদি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় মানবের মনই তাহাতে প্রধান। মন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই পরিচালক অন্তর ইন্দ্রিয় বলিয়া অন্তঃকরণ বাচ্য। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, এই মন আবার সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল। মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্, জাগ্রৎ অবস্থার সম্পূর্ণ তিরোধান ব্যতীত তাহার ক্রিয়ার কখনো বিরাম নাই। "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"। নিদ্রা গাঢ় না হইলে,

জাগ্রত্তের সম্পূর্ণ বিরতি না ঘটিলে, তমোগুণের দ্বারা মন সম্পূর্ণ অভিভূত না হইলে, রজের সামান্য সম্পর্কও থাকিলে মনের ক্রিয়াশীলতা থাকিবেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রান্ত অবস্থায় ক্রিয়াশীল মনের যে অবস্থা অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত—অনেকটা শান্ত অথচ অল্প ক্রিয়াশীল মনের যে কম্পন তাহাই স্বপ্নরূপে ভাসমান হয়, সেথানে বাহিরের সম্বন্ধ যত কম সেথানে সত্যের স্ফুরণ ক্রমে তত বেশী, স্বপ্নের সফলাফলত্ব, সত্যাসত্যত্ব এই মানসিক অবস্থা বিশেষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন দিবাভাগে মনের যে সকল আবেগ কার্য্যরূপে পরিণত হইতে পারে না এমন আহত সংকল্পগুলি রাত্রে স্বপ্নরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, এই যুক্তি বিচারসহ নহে, কারণ তাহা হইলে অনমুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের স্বপ্ন দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না, পক্ষান্তরে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত প্রভৃতি মনের কার্য্যরূপে পরিণত বিষয়গুলিরও পুনরায় স্বপ্নে উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অর্থই স্বপ্নের ঠিক, অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা না হইলে ক্রিয়াশীল মনের যে অবস্থাবিশেষ তাহাই স্বপ্ন ইহা বলা যাইতে পারে, মহামতি চরক ইন্দ্রিয় স্থানে স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

নাতি প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলানফলাং স্তথা।
ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপ্নান্ পশ্যত্যনেকধা॥

ইঃ ৫ম অঃ।

ঠিক পূর্ব্বের সেই কথা, গাঢ় নিদ্রা না হইলে মানব ইন্দ্রিয় সমূহের অধিনায়ক মনের দ্বারা সফল অফল বিবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনেও "জাগ্রৎ বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ" অর্থাৎ সুপ্ত্যবস্থায়—মনের যে জাগ্রত অবস্থায় মত বাসনার সমূহের সম্বন্ধ তাহাই স্বপ্ন এই রূপ উল্লেখ থাকায় স্বপ্ন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে, চরকের মতে স্বপ্ন দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক, এবং দোষজাত ভেদে সাত প্রকার; তন্মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় কোন বস্তু বিশেষরূপে দর্শন করিয়া তৎপরে নিদ্রা গেলে যদি সেই বস্তুরই স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলে সেই স্বপ্নকে দৃষ্ট স্বপ্ন কহে, এইরূপ কোন শব্দ বিশেষভাবে শ্রবণ গোচর করিয়া সুপ্তাবস্থাতেও সেই শব্দ অনুভব করিলে তাহাকে শ্রুত স্বপ্ন কহে, কোন বিষয় অপর কোন ইন্দ্রিয় কর্তৃক অনুভব করিয়া নিদ্রাকালেও ঠিক সেইরূপ অনুভূত হইলে তাহাকে অনুভূত স্বপ্ন কহে, কোন শ্রুত কিম্বা অনুভূত বস্তু জাগ্রত অবস্থায় একান্ত প্রার্থিত হইলে স্বপ্নেও যদি তাহাই প্রার্থিত হইয়া থাকে তাহাকে প্রার্থিত স্বপ্ন বলে, অনেক সময়ে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিগোচর হইয়া দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত হয় নাই এমন বস্তুও যদৃচ্ছাক্রমে মনে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কল্পিত পদার্থ নিদ্রাকালে অনুভূত হইলে তাহাকে কল্পিত স্বপ্ন বলা যায়, নিদ্রাবস্থায় যাহা যাহা দেখা যায় উত্তরকালেও যদি তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে তবে সেই স্বপ্নকে ভাবিত স্বপ্ন বলে, আর বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইয়া তদ্দ্বারা দোষানুরূপ যে সকল স্বপ্ন দৃষ্ট হয় সেগুলিকে দোষজ স্বপ্ন কহে।

মহামতি বাগ্‌ভটও স্বপ্ন সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন বলিয়া সেকথার আর পুনরুক্তি করিলাম না। উভয়েরই মতে কতকগুলি স্বপ্ন সফল এবং কতকগুলি স্বপ্ন অফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ভাবিক স্বপ্নকে লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে তাঁহার মতে স্বপ্ন এবং হস্ত কপালাদির রেখা প্রভৃতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্ত ভাবিজন্মের শুভাশুভ ফলপ্রতিপাদক। যেমন স্বপ্নে রক্তবর্ণ-বস্ত্রাবৃতা কামিনী দর্শনে অর্থপ্রাপ্তি, হস্তস্থিত উর্দ্ধরেখা যশোবিত্তাদায়িনী ইত্যাদি, সুতরাং তাঁহার মতে এবং জন্মান্তরবিশ্বাসীর পক্ষে স্বপ্ন অমূলক নহে।

সম্প্রতি এই স্বপ্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্পর্ক কি তাহার আলোচনা করাই আমার প্রবন্ধোক্ত শেষ বিষয়। আয়ুর্ব্বেদে স্বপ্নের রোগকর্তৃত্ব এবং রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া অনেকেই ঐগুলি ঋষিদের কল্পিত উক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা আগম অর্থাৎ আপ্তবাক্যে বিশ্বাসপরায়ণ, প্রত্যক্ষাদির মত ঋষিবাক্যকেও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছি, সুতরাং উহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে কিনা আমাদিগকে মানব বুদ্ধি হিসাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। রোগের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঋষি বলিতেছেন—

"রোগস্ত দোষ বৈষম্যং দোষ সাম্যমরোগিতা" অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের সমতা সম্পাদনই আরোগ্য। এই বৈষম্য আবার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি বহুভেদে বিবিধ এবং অনিষ্টসংযোগ প্রিয়বিয়োগাদি বহু কারণজাত বলিয়া বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। সাধারণতঃ বায়ু পিত্ত কফ রোগকারী হইবার পূর্ব্বে ছয়টী অবস্থায় অবস্থান্তরিত হয়, তাহারা এই :—সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদ। একটী কথা এস্থলে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি, আমি সাধারণ সভার সমক্ষে বিস্তৃত আয়ুর্ব্বেদের বিমল-বিপুল-বুদ্ধিকে ও আকুলকারী বিষয় সকল অল্প সময়ে অতি সংক্ষেপে অতি সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিতেছি। এমত অবস্থায় বঙ্গানুবাদের শব্দগুলি বিচার করিয়া নিরর্থকত্বাদি দোষ প্রমাণ করিতে গেলে আমার ত্রুটী অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং বক্তব্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

বায়ু পিত্ত কফের পূর্ব্বোক্ত সঞ্চয়াদি ৬টী অবস্থা ঋতুবিপর্য্যয়, আহারবিহারবিপর্য্যয়াদি প্রকোপক কারণবশতঃই পর পর সংঘটিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই উষ্ণ শীতল পান আহারাদির প্রার্থনা, গাত্র ভার, গাত্র দাহ, গাত্র কণ্ডুয়নাদি পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সমূহ মানবদেহে প্রকাশ করিয়া থাকে, ক্রম প্রকাশমান ঐ সকল লক্ষণগুলিই রোগের সামান্ত পূর্ব্বরূপ, সম্প্রাপ্তি ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ রূপ প্রভৃতি নামে রোগের অবস্থা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ছয়টীর মধ্যে ব্যক্তি এবং ভেদ অবস্থাদ্বয় রোগরূপে প্রকাশীভূত অবস্থাও তৎপূর্ব্বগুলি সম্প্রাপ্তি পূর্ব্বরূপাদির প্রকাশক। দৃষ্টান্তস্বরূপ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বরূপ লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ভাবি ব্যাধিপ্রকাশক চিহ্ন,এই রোগের

পূর্ব্বরূপে উল্লিখিত শ্বাস, গাত্রমর্দ্দন,কফসংস্রব, তালুর শুষ্কতা, বমি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বৈষম্য গত বায়ু পিত্ত কফেরই আত্মলক্ষণ, যক্ষ্মা ত্রিদোষ জনিত ব্যাধি বলিয়া তিনটী দোষেরই প্রকোপক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, বায়ু পিত্ত কফের প্রত্যেকেরই প্রকৃত অর্থাৎ সুস্থ এবং বিকৃত অর্থাৎ রোগকারী অবস্থার পৃথক পৃথক স্বরূপ আছে, বাহুল্য ভয়ে আলোচনা করিলাম না। সংক্ষেপে পরে বলিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে রোগের পূর্ব্বরূপ রূপাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকুপিত দোষের প্রকোপ প্রসরাদি অবস্থাবিশেষেরই প্রকাশ মাত্র সুতরাং যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপে প্রকাশিত শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতির সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গতই।

এখন দেখা যা'ক ঐ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্ব রূপে প্রকাশিত অপর কতকগুলি লক্ষণ যুক্তিমূলক কি না। ঋষি বলিতেছেন যাহার যক্ষ্মারোগ হইবে সে ব্যক্তি স্বপ্নে কাক, শুক, শল্লকী, ময়ূর, শকুনি, বানর প্রভৃতি কর্ত্তৃক বাহিত হইবে অথবা সেগুলি এবং শুষ্ক নদী ও ঝড়, বাতাস, দাবাগ্নিপীড়িত বৃক্ষ সকল দর্শন করিবে, আশ্চর্য্য কথা বটে। ঋষিরই কথা দোষ বৈষম্যে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকুপিত দোষেরই অবস্থা ভেদে আত্মপ্রকাশক ঈষৎ ব্যক্ত লক্ষণসমূহ পূর্ব্বরূপ ভাবে ভাবিব্যাধি প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই ঋষিরই এই আবার কি অদ্ভূত কথা! দেখা যা'ক ঋষির উক্তিতে ইহার কোন মীমাংসা মিলে কি না। ঋষি বলিতেছেন, পশু,পক্ষী প্রভৃতি জীববিশেষে কতকগুলি ধর্ম্ম উৎকট অর্থাৎ প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে। আপনারাও সকলেই জানেন ময়ূরই ষড়জ অর্থাৎ উদারঃ মুদারা তারার ১ম স্বর্ন্ করিতে বিশেষ পটু, "ষড়জং ময়ূরা বদন্তি", "ষড়জ-সংবাদিনী কেকা" প্রভৃতি প্রয়োগও পাওয়া যায়; তেমনি কোকিল পঞ্চম ধ্বনিতে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক এরূপ জীব বিশেষে, বিশেষ ধর্ম্মের প্রাবল্য স্বতঃ সিদ্ধ।

ঋষি বলিতেছেন, মানবের জন্মকালীন শুক্র শোণিতের সম্পর্ক সময়ে এবং তৎপরে মাতার আহার বিহার প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে বাত পিত্ত কফের মধ্যে যে দোষের প্রবলতা ঘটে, সেই দোষেরই লক্ষণ সমূহ মানব প্রকৃতিতে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি পুরুষের সংসার।

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ)

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা, পুমাংস-মভ্যেতি ভবান্তরেপি।" সতী স্ত্রী যেমন জন্মজন্মান্তরে সেই একই পুরুষেরই অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবের নিশ্চলা প্রকৃতিও জন্মজন্মান্তরে সেই একই পুরুষেরই অনুগমন করিয়া থাকে। গৃহিণী ব্যতিরেকে যেমন

গৃহপত্তির গৃহস্থলী পাতান হয় না, তেমনি প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের সংসার করা চলে না। প্রকৃতির জন্যই পুরুষের সংসারে আসা। পুরুষ—প্রকৃতির আকর্ষণে ভোগ-বাসনার তৃপ্তির জন্য সংসার পাতাইয়া বসে, এবং ভোগ বাসনার নিবৃত্তি হইলে সংসার লীলার অবসান করিয়া থাকে। কোন্ অনাদি কাল হইতে প্রকৃতি পুরুষের এই সংসার-লীলা চলিয়া আসিতেছে, তাহা সেই প্রকৃতি পুরুষই জানে। শাস্ত্র বলেন,—"উভাবপ্যনাদি উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌচ সর্ব্বগতাবিতি"

যাহা ত্যাগ করিলে সে বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন দগ্ধ করা আগুনের ধর্ম্ম। সেই দগ্ধ করার শক্তিটুকু নষ্ট হইয়া গেলে আগুনের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, আগুন ভস্মে পরিণত হয়। এরূপ প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের প্রাণ। প্রাণ চলিয়া গেলে সবই চলিয়া যায়। মানুষের এত যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য, এ সমস্তই প্রাণের সহিত বাস করে,—প্রাণ চলিয়া গেলে সবই চলিয়া যায়। ধর্ম্মে ও প্রাণে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যাহার প্রাণ আছে, তাহার ধর্ম্মও আছে এবং যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার প্রাণও আছে। দেহে যত দিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহধর্ম্মও রক্ষিত হয় এবং যখনই দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, তখনই দেহধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। ধর্ম্মব্যতিরেকে কোন বস্তুই কখনই অবস্থান করিতে পারে না। এজন্য সকল পদার্থই সর্ব্বদা স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে। এই স্বধর্ম্ম রক্ষা করার প্রবৃত্তির নাম প্রকৃতি। সকলের ধর্ম্ম এক নয়, কাজেই তাহাদের রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিও এক রকমের নয়। সুতরাং সকলের প্রকৃতিও এক রকমের নহে। জলের ধর্ম্ম শৈত্য এবং আগুনের ধর্ম্ম ঔষ্ণ্য,—কাজেই এই ধর্ম্ম দ্বয়ের পার্থক্যবশতঃ উহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম-রক্ষা করার প্রবৃত্তিও পৃথক্। সেজন্য উভয়ের প্রকৃতিও পৃথক্।

জগতের পদার্থ সকলের যেমন সংখ্যা করা যায় না,—তদ্রূপ প্রকৃতিও সংখ্যা করা যায় না। যত পদার্থ তত প্রকৃতি। চেতন একটি পদার্থ এবং অচেতন একটি পদার্থ। উভয়ের ধর্ম্মের পার্থক্য আছে;—সুতরাং উভয়ের ধর্ম্মরক্ষা করার প্রবৃত্তি অনুসারে প্রকৃতিরও পার্থক্য আছে। যদিও চেতন পদার্থ মাত্রেরই এক চৈতন্যধর্ম্ম এবং অচেতন পদার্থ মাত্রেই এক জড়-ধর্ম্ম—তথাপি উক্ত চেতন বা অচেতন পদার্থনিচয়ের আকৃতি গত বহু পার্থক্য আছে। তদ্রূপ উহাদের প্রকৃতিগতও বহু পার্থক্য আছে। চেতন বলিয়া সকল চেতনেরই একরূপ প্রকৃতি হয় না। মানুষ চেতন পদার্থ, গরুও চেতন পদার্থ, উভয়ের একই চৈতন্য ধর্ম্ম। কিন্তু সেই একই চৈতন্য যখন গো মনুষ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন উহাদের প্রকৃতিও পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। সে জন্য মানুষ যাহাতে তৃপ্তি

(আয়ুর্ব্বেদ সভার গত বৈশাখের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।)

লাভ করে, গরু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করে না। এইরূপ প্রত্যেক চেতন পদার্থমাত্রেই ভিন্ন। মানুষের দেহ রক্তমাংসময় জড়পদার্থ, গরুর দেহও রক্তমাংসময় জড়পদার্থ, উভয়েই জড়পদার্থ, উভয়েতেই এক জড়ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তথাপি উভয়ের দেহ ভিন্ন বলিয়া উভয়ের দৈহিক প্রকৃতি ও দেহধর্ম্ম ভিন্ন। কাজেই উভয়ের প্রবৃত্তিও ভিন্ন। সে জন্ম গো দেহের রক্ষা ও পুষ্টির জন্ম গরুকে ঘাস খাওয়াইতে হয়। মানুষকে তাহা খাওয়াইতে হয় না। মানুষ দ্বিপদ জীব এবং গরু চতুষ্পদ পশু, অতএব উভয়ের একই রক্তমাংসময় জড় দেহ হইলেও উহাদের দৈহিক প্রবৃত্তি ভিন্ন,—একথা বলিতে পারা যায় না। গরু ও বাঘ উভয়েই চতুষ্পদ চেতন পদার্থ এবং উভয়েরই রক্ত মাংসময় জড় দেহ,—তথাপি উভয়ের প্রকৃতি এক নহে, সম্পূর্ণ বিপরীত। গরু যাহা খাইয়া দেহ রক্ষা করে, বাঘ তাহা খায় না; অধিকন্তু বাঘ গরুকেই খাইয়া দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব চেতন পদার্থ মাত্রেরই এক প্রকৃতি নয় এবং জড় পদার্থ মাত্রেরই এক প্রকৃতি নয়।

জড় ও চেতনের যত আকৃতি আছে প্রকৃতিও তত প্রকারের আছে। অধিকন্তু আকৃতি ব্যতিরেকেও প্রকৃতির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একই মানুষের—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র-ভেদে—প্রকৃতি ভিন্ন। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি শূদ্রের মত নহে এবং শূদ্রের প্রকৃতি ব্রাহ্মণের মত নহে। শুধু তাহাই নহে—একই ব্যক্তির বাল্যে যেরূপ প্রকৃতি থাকে যৌবনে তাহার পরিবর্ত্তন হয় এবং যৌবনের প্রকৃতি বার্দ্ধক্যে থাকে না। দেশ কাল পাত্র কার্য্যাকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা একই প্রকৃতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি অনুসারে প্রবৃত্তিও পৃথক। প্রবৃত্তির অপর নাম রুচি। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" যত লোক তত রুচি, কাজেই সেই সকল রুচির পরিতৃপ্তির উপাদানও পৃথক্। সাধু অসাধুর এক রকম রুচি নহে। নর বানরের এক রকম রুচি নহে। সেজন্ম উহাদের জীবনযাত্রার পথও এক রকম নহে। তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বানরাদির জীবদেহে পরীক্ষিত ঔষধ সকল নরদেহে তুল্য কার্য্যকরী বলিয়া কেন যে স্থির সিদ্ধান্ত করেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে যে সকল মানুষের বানরের মত প্রকৃতি অথবা যেখানে নর বানরের প্রকৃতির সামঞ্জস্য আছে তথায় তাদৃশ ঔষধ পথ্য সকল ফলপ্রদ হইতে পারে একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি।

পুরুষ চেতন। প্রকৃতি জড়। তথাপি অবিচ্ছিন্নভাবে চেতন-পুরুষের সঙ্গে বাস-করার জন্ম জড়-প্রকৃতিও পুরুষের চৈতন্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চেতনের প্রবৃত্তি লাভ করে। যেমন একটী লৌহ-গোলককে তীব্র অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত করিলে উহা স্বাভাবিক শৈত্য ত্যাগ করিয়া অগ্নির ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অচেতন প্রকৃতিও চেতনবৎ কার্য্য করিতে থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত হইলেও উভয়ের সদ্ভাব ও প্রীতির অন্ত নাই। দুই জনে কখনই ছাড়াছাড়ি থাকিতে পারে না,—পৃথক হইলেই মৃত্যু। প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের আনন্দ বিধান করা, এজন্ম

প্রকৃতি কতরূপে যে আত্ম প্রকাশ করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রকৃতি পুরুষের তৃপ্তির জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ত্যাগ করে, এমন কি সে আর নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রাখিতে চায় না। এই যে প্রকৃতির পুরুষের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। এই যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, —ইহার বিনিময়ে পুরুষও প্রকৃতির জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে। পুরুষেরও প্রেমের অন্ত নাই সীমা নাই। পুরুষও প্রকৃতির প্রেমে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া যায়। অমন যে নিত্য সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, স্বতন্ত্র, বশী নিত্যতৃপ্ত পুরুষ,—সেও প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া এমনই হইয়া যায় যে,—সদাই নিজকে নানাবিধ আধিব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া দীন দুঃখীর ন্যায় জন্মাজন্মান্তরে প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া কামাতুর মৃগের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারই নাম সংসার।

পুরুষের দুইটী ভোগায়তন আছে; একটী দেহ, অপরটী মন। যদিও ইহারা দুইটী পৃথক পদার্থ, তথাপি ইহারা প্রকৃতিপুরুষের ন্যায় অভেদে বাস করে। পরস্পরের সদ্ভাবও বড় বেশী। এজন্য মন ভাল থাকিলে দেহ ভাল থাকে এবং দেহ ভাল হইলে মনও ভাল হয়। কখনও যে ইহাদের কলহ হয় না, একথা বলা যায় না। তবে সাধারণতঃ একের ভালমন্দে অপরেরও ভালমন্দ প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যত পদার্থ তত প্রকৃতি। মনের যেমন সত্ত্বরজ-স্তমোময়ী প্রকৃতি আছে, দেহেরও তেমনই বাতপিত্তকফময়ী প্রকৃতি আছে। মনের প্রকৃতির কর্ম্ম সদাই মনকে সন্তুষ্ট রাখা এবং দেহের প্রকৃতির কর্ম্ম সদাই দেহকে সন্তুষ্ট রাখা। সকলেরই স্বভাবে সুখ, আনন্দ ও স্থিতি এবং স্বভাবের বৈপরীত্যে দুঃখ, বিষাদ ও মৃত্যু। এজন্য মানসী ও শারীরী প্রকৃতি সর্ব্বদা স্বভাবে থাকিয়া দেহ মনকে প্রকৃতিস্থ বা স্বস্থ রাখিতে চেষ্টা করে। জীবের দেহ অন্নময়। অন্নের অভাবে দেহ বাঁচে না। এ জন্য দেহের কোন অভাব উপস্থিত হইলে অন্নের দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়। দেহের মধ্যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও মল আছে। এ সকলই এক অন্ন বা খাদ্য পদার্থের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। দেহের বা মনের যাহা যাহা উপাদান, দেহ-পোষক অন্নেরও সেই সেই উপাদান আছে। এ জন্য মানুষ যে সকল পদার্থ ভোজন করে,—সেই সকল পদার্থের রসই রক্তরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীরের যাবতীয় ধাতুকে পোষণ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। এজন্য ভুক্ত পদার্থের প্রকৃতির অনুসারে রসের প্রকৃতি হয়, রসের প্রকৃতি অনুসারে রক্তের এবং অন্যান্য ধাতু সকলের ও মনের প্রকৃতি হয়। দেহ যেমন কেবল স্থূল পদার্থ, মন সেরূপ নয়; মন সূক্ষ্ম পদার্থ। স্থূলের দ্বারা যেমন স্থূলের গ্রহণ হয় তেমনই সূক্ষ্মের দ্বারা সূক্ষ্মের উপলব্ধি হয়। এই দেহ ও মনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কতকগুলি ভৃত্য আছে। তাহারা সর্ব্বদা মনের অধীনে থাকিয়া পুরুষের অভিমত কর্ম্ম সম্পাদন করে। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—শারীর এবং মানস।

শারীর কর্ম্ম—গমন, ভোজন ইত্যাদি এবং মানস কর্ম্ম সঙ্কল্প, বিকল্প ইত্যাদি। শারীরিক

কর্ম্মের ভৃত্যগণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মানসিক কর্ম্মের ভৃত্যগণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে ;—এই সকল ভৃত্যই মনের দ্বারা চালিত হয়। মনের মালিক জ্ঞান, জ্ঞানের মালিক জীবাত্মা বা পুরুষ। পুরুষের ইচ্ছা জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়, জ্ঞান তাহা মনকে আদেশ করে, মন ইন্দ্রিয়গণকে আদেশ করে, ইন্দ্রিয়গণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে। এই জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ লইয়া প্রকৃতি পুরুষের সংসার।

জীবাত্মা একজন ঘোর সংসারী পুরুষ। প্রকৃতি তাহার গৃহিণী। দেহ তাহাদের গৃহ। এই গৃহের যেখানে যেটার আবশ্যক এবং এই গৃহ মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের যখন যাহা আবশ্যক,—সে সমস্তই অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ সদাই ব্যস্ত। ইহা ছাড়া তাহাদের ধর্ম্মই যেন নাই। এজন্য দেহে যখনই যে পদার্থের দরকার হয়, প্রকৃতি তখনই সেই জিনিস চাহিয়া লয়। দেহে জল, আগুন, হাওয়া আছে। এ জন্য জলের দরকার হইলে পিপাসা আসিয়া জল চায়, শরীরের উত্তাপ কমিয়া গেলে গরম ঔষধ পথ্য চায় এবং হাওয়ার আবশ্যক হইলে উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া নিশ্বাস লইয়া বাঁচে। মনের মধ্যে প্রকৃতির সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী তিনটী সন্ততি বাস করে এবং দেহের মধ্যেও বায়ু পিত্ত কফ নামক তিনটী বিরুদ্ধস্বভাব সন্তান বাস করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ইহারা যদি পরস্পরে সদ্ভাবে বাস করে তাহা হইলে সংসারে কতই সুখ, কতই আনন্দ। কিন্তু ইহারা মনের অধীন বাস করে বলিয়া বড়ই অসংযত। সকলেই বড় হইতে চায় এবং একজন অপরকে ধ্বংস করিতে চায়। এজন্য ইহাদিগকেও বড় দোষ দিতে পারা যায় না। কেন না, মন যখন লোভ পরবশ হইয়া মিথ্যা আহার বিহার করিতে থাকে, তখনই সেই মিথ্যা আহার বিহারের জন্য উহাদেরও প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে, এজন্য ইহারা প্রবল বা কুপিত হইয়া দেহরূপ সংসারে বড়ই বিরোধ উপস্থিত করে। সেই বিরোধ যখন মনকে আশ্রয় করে, তখন পুরুষের আধি এবং যখন দেহকে আশ্রয় করে তখন ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এবং বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ বা প্রাবল্য যাহাতে না উপস্থিত হয়, তাহার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ সর্ব্বদা চেষ্টা করে। ইহাদের পরম প্রিয় শান্ত দান্ত ও বিচারশীল সন্তান-জ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানের উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। জ্ঞানও সর্ব্বদা প্রকৃতি পুরুষের অনুকূল বিষয়ে মনকে প্রবৃত্ত ও অননুকূল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে। এইরূপে যতদিন মন জ্ঞানের অধীনে থাকে এবং মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গণ থাকে, ততদিন আর দেহ আধিব্যাধির মুখ দেখিতে পায় না, দেহ মন তখন পরম আনন্দনিকেতন। বাহ্য জগতে যেমন ঝড় বৃষ্টি বা অগ্নির প্রাবল্য অথবা প্রকোপ উপস্থিত হইলে নানাবিধ উপপ্লবের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ বা মনে বাতাদি দোষত্রয়ের অথবা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকোপ বা প্রাবল্য উপস্থিত হইলে দৈহিক বা মানসিক প্রকৃতিরও বিকৃতি উপস্থিত হয়। সন্তানের সুখ দুঃখেই জননীর সুখ দুঃখ। এজন্য বাতাদি সন্তান-

গণের যখনই কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তখনই প্রকৃতি উহা জানিতে পারে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য পুরুষকে নিবেদন করে। পুরুষও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের জন্য জ্ঞানকে আদেশ করে। জ্ঞানও আবার মনকে তাহার প্রতীকারে নিযুক্ত করে, মনও ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রিয়গণ বড়ই কার্য্যতৎপর, বিশেষতঃ মন যখন তাহাদের সহায় হয়। কাজেই মনের আদেশে ইন্দ্রিয়গণ তখনই তৎকর্ম্ম সাধন করিয়া পুরুষের জ্ঞান মন ও দেহের সকল কার্য্যের সমাধান করিয়া নিজেরাও ধন্য হয়। এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের পরস্পর সদ্ভাব ও নিয়মানুবর্ত্তিতা,—ইহাই পুরুষের স্বাস্থ্য,—প্রকৃতি ইহাতেই সন্তুষ্ট। পুরুষের মনের মত এমন সর্ব্ব-কর্ম্ম-সাধনক্ষম ভৃত্য আর কেহ নাই। কিন্তু সকল গুণের গুণী হইলেও উহার স্বভাব বড় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল। মন সদাই বিপথে চলিয়া একটা না একটা অনিষ্ট ডাকিয়া আনিতে চায়। এজন্য পুরুষ মনকে একলা ছাড়িয়া দিতে পারে না,—জ্ঞানকে তাহার রক্ষক ও চালক নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। জ্ঞান সর্ব্বদাই মনকে লইয়া ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানের কর্ম্মক্ষেত্র এই দেহও সংসার। জ্ঞান এই পুরুষের আদেশে এই দেহ ও সংসার হইতে অভিমত ভোগ্য বস্তু সকলের রসাস্বাদ ও নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করে। মনও জ্ঞানের অধীন থাকিয়া কি করিয়া দেহ সুস্থ থাকিবে এবং কি করিয়া দেহ নীরোগ, বলবান ও সৌন্দর্য্যময় হইবে এবং কি করিয়া সংসারের সর্ব্ব প্রকার বিষয়রসপান করিয়া পুরুষের সংসারাসক্তির পরিতৃপ্তি করিবে,—এই চিন্তা লইয়া সদা ব্যস্ত থাকে।

যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মবশে মোহগ্রস্ত না হয়, তত দিনই এই জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রকৃতিকে লইয়া পুরুষের সংসার। আর যখনই পুরুষ—কলোন্মুখ-প্রাক্তন-কর্ম্মবশে মোহগ্রস্ত হয়, তখনই তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে, অজ্ঞান আসিয়া জ্ঞানকে আশ্রয় করে। তখন সত্য-মিথ্যা, হিতাহিত মেধ্যামেধ্য, পথ্যাপথ্য ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মন আর জ্ঞানের শাসন মানে না। একেত মনের বহির্মুখ-বৃত্তিতা বড়ই প্রবল, তাহাতে আবার জ্ঞানের শাসন নাই, কাজেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া মন একেবারে বিষয় সুখে মজিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিছুতেই আর ঘরে ফিরিতে চাহে না;—কাজেই প্রকৃতি পুরুষের আর দুঃখের অন্ত থাকে না। বুদ্ধির অপর নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাপরাধই সকল অনিষ্টের মূল। সংসারে যত প্রকার আধি ব্যাধি আছে, সে সকলেরই মূল একমাত্র প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধেই মানুষের সত্য মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়—, মানুষ সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করে। ইহাই জীবের বিনাশ কাল,—এজন্য লোকে বলে "বিনাশ-কালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ।"

জগতে ভালমন্দ, সত্য মিথ্যা, হিত অহিত, পথ্য অপথ্য, শত্রু মিত্র, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ বলিয়া প্রকৃত দ্বৈত বস্তু কিছুই নাই। যে বস্তু ভাল তাহাই মন্দ, যাহা সত্য তাহাই

মিথ্যা, যাহা হিত তাহাই অহিত, যে শত্রু সেই মিত্র, এবং যাহা সুখ তাহাই দুঃখ। দেশ কাল পাত্র ও প্রয়োজন অপ্রয়োজনাদির অবস্থা ভেদেই এক বস্তর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ হইয়া থাকে। যে অর্থের জন্ত মানুষ সারাটা জীবন খাটিয়া মরে, যাহার বিদ্যমানতাই তাহার সকল সুখের নিদান,—সেই অর্থই বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে যত অনিষ্টের, যত দুঃখের মূল হইয়া থাকে। যে স্ত্রীকে দেখিলেই যুবকের আনন্দ, সেই স্ত্রীই যখন অক্ষম স্বামীর সমক্ষে দুষ্টের কবলিত হয়, তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। যে ভোজ্য বস্ত সকল দেখিয়াই ক্ষুধার্ত্তের আনন্দ, সেই সেই ভোজ্য বস্তর দর্শনই আবার সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির পরিতৃপ্তির পর বিবমিষার কারণ হইয়া থাকে। শিশিরে যে শীত-বাধা নিবৃত্তির জন্ত মানুষ কত না শাল দোশালা গায়ে দেয়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সেই শীতের জন্ত আবার সেই মানুষই লালায়িত হইয়া কত না অর্থ ব্যয় করিয়া দার্জ্জিলিং সিমলা ঘুরিয়া বেড়ায়। চিকিৎসক যে শৈত্যক্রিয়াকেই পিত্তশান্তির পরমৌষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—সেই শৈত্যক্রিয়াকেই আবার শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির প্রাণহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা একজনের পক্ষে বিষ, তাহাই অপরের পক্ষে অমৃত অথবা একই মানুষের পক্ষে একদিন যাহা ত্যাজ্য ছিল,আর একদিন তাহাই সেই মানুষের পক্ষে পরম গ্রাহ্য। যখন যাহা দ্বারা জীবের অভিমত সিদ্ধি ঘটে, তখনই তাহা তাহার পক্ষে গ্রাহ্য; তদিতর পদার্থ অগ্রাহ্য। বাস্তব পক্ষে কোন বস্তই একান্ত হিতকর অথবা একান্ত অহিতকর নহে। যাহা দ্বারা প্রকৃতির দুঃখ উৎপন্ন হয়, পুরুষের আনন্দময়-স্বরূপতার হানি ঘটে, তাহাই ত্যাজ্য, তাহাই অপ্রিয় ও তাহাই অসাধ্য। একই পদার্থে হিতাহিতত্ব সাধ্যাসাধ্যত্ব অবস্থান করে। পুরুষের প্রজ্ঞাই তাহার বিচার করিয়া দ্রব্যান্তর সংযোগে অথবা সংস্কার দ্বারা কিংবা মাত্রা বা কালাদি দ্বারা প্রকৃতির অনুকূল করিয়া দেয়। একই তাম্রে বমনকারকতা ও বমননিবৃত্তির শক্তি আছে। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষই তাহা প্রকৃতির প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেখা যায়, জগতে যাবতীয় পদার্থই যুগপৎ সুখদুঃখময় এবং আধি-ব্যাধির উৎপাদক ও প্রশমক। কেবল গ্রহণ কর্ত্তার প্রকৃতির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার অনুরোধে পদার্থ সকলের গুণ দোষের বিচার হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে প্রজ্ঞার দ্বারা এই বিচারকার্য্য অহোরহঃ করিতেছে। এবং যখনই নিজের বিচার বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ আপ্ত জনের আদেশ গ্রহণ করিতেছে। প্রজ্ঞাই প্রকৃত মানুষের পরম হিতৈষিণী। ইহার কোন অপরাধ হইলে প্রকৃতির সংসারে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ভোগী পুরুষ যেমন সস্ত্রীক রথারোহণ করিয়া সংসারে অভিমত প্রদেশে বিচরণ করে, তদ্রূপ প্রকৃতি এবং পুরুষও এই দেহ রথে আরোহণ করিয়া ভোগ-কামনার নিবৃত্তির জন্ত অভিমত প্রদেশে রথচালনা করে ও অনভিমত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এই দেহ রথের ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা

ইহারই সারথি এবং মন ঐ ইন্দ্রিয়গণের মুখ সংযুক্ত রশ্মি বা লাগাম। সংসারী পুরুষের ভোগ-তৃপ্তির জন্যই সংসারে আসা। এজন্য সংসারী জীব কেবল ভোগের ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়। জগতে ভোগের বস্তু তো আর অভাব নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় একান্ত সুখময় বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই,—যাহা আজ সুখ দেয়, তাহাই আবার কালে যত দুঃখের মূল। এজন্য প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-সাধক মনকে সদাই প্রজ্ঞার দিকে নজর রাখিয়া জ্ঞানের আদেশে চলিতে হয়। জগতে সাধু অসাধুর একইরূপ, আর মনের নাই বিচার-শক্তি। এজন্য মনকে সর্ব্বদা জ্ঞানের নিকট বিধিনিষেধের আদেশ লইয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ মাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে। সকলেই সকল বিষয় জানে না। কাজেই বুদ্ধিমান পুরুষকে কল্যাণের জন্য পদে পদে জ্ঞানীর নিকট শরণ লইতে হয়, রুগ্নকে চিকিৎসকের শরণ লইতে হয়। তাঁহারা বিধিনিষেধের দ্বারা চলিবার উপদেশ দেন। তাহা যাহারা মানিয়া চলে, তাহাদেরই সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়। এবং যাহারা না মানিয়া স্বৈরাচারী হয় তাহাদের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বিধিনিষেধেই সংযম আসে, সংযমেই জীবন অসংযমেই মৃত্যু।

প্রকৃতি পুরুষের সংসারে যত অনিষ্টের মূল উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত অসংযত পুত্র যেমন সর্ব্বদা মাতা পিতার ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ অসংযত বিধি নিষেধরূপ শাসনের বহির্ভূত মনই একমাত্র দেহে সকল আধি ব্যাধিকে ডাকিয়া আনে। এই অশান্ত মনের জন্য প্রকৃতি পুরুষ ও জ্ঞান সদাই সন্ত্রস্ত। ভয়, মন কখন কি করিয়া বসে। মনের দৃষ্টি সর্ব্বদা বাহিরের দিকে। তাহাতে যে তাহার মরণ হয়, সে তাহা বুঝে না। আপাত সুখ হইলেই সে সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে যাহা হইবে হউক, তাহাতে তাহার কোন ভাবনা নাই। কেন না, সে ভোগ তো আর সে ভুগিবে না, ভুগিবে কর্ত্তা গিন্নী, প্রকৃতি ও পুরুষ। মনের বিধিনিষেধ জ্ঞান নাই—কাজেই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, আপনাপর কোন বিচারই নাই। এজন্য প্রকৃতিকে সর্ব্বদা জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া মনের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মন যখন বাহ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিষময় ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতি তখন চক্ষুতে আসিয়া সংশয় উৎপাদন করে। বলে, ইহার রূপ আমার অভিমত নহে, ইহ কে ত্যাগ কর। মন যদি তাহা না শুনিয়া মুখের কাছে লইয়া আসে, প্রকৃতি ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তাহাতেও যদি মন নিবৃত্ত না হইয়া মুখে পুরিয়া ফেলে, তখন বমনাত্মিকা প্রকৃতি বড়ই বিরক্ত হয়, বিব-মিষা আসিয়া কণ্ঠরোধ করে এবং যদি কোন প্রকারে উহা উদরস্থ হয় তো বমি করিয়া তাহা দেহ হইতে দূর করিয়া দেয়। যদি প্রকৃতি বমন বিরেচন দ্বারা উক্ত বিষময় পদার্থকে দেহ হইতে বিতাড়ন করিতে না পারে এবং উহা রস রূপে পরিণত হয়,—তাহা হইলে প্রকৃতি সেই বিষের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য রসের বিকার ঘটাইয়া রসবিকৃতির জন্য ব্যাধির উৎপত্তি করে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করে। চিকিৎসক তখন প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া রোগের ব্যবস্থা

করিয়া দেন। তাহাতে সেই সেই রোগের সহিত বিষের সকল বিকারের বিনাশ ঘটে। যদি রসে গিয়া বিষের প্রতীকার না হয়,—তাহা হইলে প্রকৃতি অন্যান্য ধাতু সকলের সাহায্যে তাহাকে দেহের এক স্থানে গণ্ডী দিয়া আবদ্ধ করিয়া রোগরূপে আবির্ভাব করে। তখন তাহাকে ধ্বংস করিবার সুবিধা হয়। প্রকৃতির এই ব্যবস্থার নাম রোগ। প্রকৃতি নিজেই দেহের চিকিৎসা করে, সেজন্য সদ্যঃপ্রাণহর ব্যাধি ব্যতিরেকে সকল ব্যাধিকে দেখিয়াই অভিজ্ঞ বৈদ্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করেন না। মূর্ত্তি দেখিয়াই শত্রুমিত্র চেনা বড়ই কঠিন। শত্রুও কখন পরম মিত্রের কাজ করে। বাত-পিত্ত-কফ যখন প্রবল অথবা প্রকুপিত হইয়া দেহকে দুঃখিত করিতে থাকে, অথচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না, তখন জ্ঞানী ব্যক্তির বড়ই চিন্তার বিষয় হয়। অজ্ঞানী তখন ভাবে, কোন রোগ তো হয় নাই, তবে আর উহার জন্য ভাবিয়া ফল কি? কুপিত বাতাদি দোষকে প্রকৃতি যখন কোন স্থান-বিশেষ বা ভাব-বিশেষে ব্যাধিরূপে ধরিয়া আনিয়া দেয়, তখন জ্ঞানী-ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়েন। ভাবেন এইবার ইহার একটা প্রতিকার করা যাইবে, প্রকৃতি তাহারাই ব্যবস্থা করিয়াছে। অজ্ঞানী তখন বিপরীত বুঝে। সে ভাবে রোগ যখন হইয়াছে, তখন সেই রোগেই হয় তো তাহার মৃত্যু হইবে। রোগই যে আরোগ্যের মূর্ত্তি একথা নির্ব্বোধ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। প্রকৃতিই দেহকে নীরোগ করিবার জন্য রোগ রূপে সকল গ্লানিকে দূর করিয়া দেয়। এ জন্য আমাতিসারে স্তম্ভন, রক্তপিত্ত অথবা রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় রক্তরোধ, জ্বরের প্রথমাবস্থায় কষায়-পান, তরুণ জ্বরে মুখ্য ভেষজ দিয়া জ্বর বন্ধ করিয়া দিলে বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতির প্রবৃত্তি মাত্রেই বাধা দিবে না। দেহকে নীরোগ রাখিবার জন্যই মল মূত্রাদির বেগ আসে, সে বেগের রোধ করিলে অশেষবিধ ব্যাধি আসিয়া শরীরকে দুঃখিত করে। গর্ভ কালে গর্ভস্থ শিশুর অভিলাষ সকল জননীর দোহদরূপে প্রকটিত হয়। দোহদের অবমাননায় সন্তানের বিকৃতি ঘটে। এজন্য গর্ভিণী যদি গর্ভের অপকারক কোন দ্রব্যে অভিলাষ করে, তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিয়া হিত সংযোগে প্রয়োগ করিবে, তথাপি প্রকৃতির অবমাননা করিবে না। প্রকৃতি সর্ব্বকল্যাণময়ী। জীবকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বিকৃতির সহিত লড়াই করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতি দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগকে সাম্‌লাইতে পারে না। তখন সেই দুর্ব্বলা প্রকৃতি বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করে। যিনি প্রাণাভিসর বৈদ্য, তিনিই সেই প্রকৃতির কি যে অভাব তাহা বুঝিতে পারেন এবং রোগীর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতির প্রার্থনানুকূল ঔষধ ও পথ্য দিয়া থাকেন। প্রকৃতি তাহাতে বললাভ করিয়া কৃতার্থ হয়,—রোগী আরোগ্য লাভ করে। যাহার প্রকৃতি আরোগ্যের জন্য কামনা করে না, সেজন্য যে কোন ঔষধ বা পথ্য দেওয়া হউক না কেন, তাহাতেই যদি সে বিরক্ত হয়, তবেই বুঝিতে হইবে প্রকৃতি আর সে

দেহে সংসার করিতে চাহিতেছে না এবং দেখা যায় প্রকৃতি পুরুষকে লইয়া অচিরে সেই রুগ্ন ভগ্ন দেহাবাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবারই ব্যবস্থা করিতেছে। প্রকৃতি যদি আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করে, তাহা হইলে কাহারও ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে। প্রকৃতির এই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, ইহা করুণাময় জগদীশ্বরের দান। এই দান হইতে জগতের কোন পদার্থই বঞ্চিত নহে। সুতরাং জগতে ভগবৎকৃপায় কোন জীবেরই মৃত্যু নাই। সত্যই তাই, জ্ঞানীর চক্ষে মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিলেই পূর্ব্বাবস্থার মৃত্যু হইয়া থাকে। একই শিশু যৌবন দশায় উপনীত হইলে তাহার শিশুত্বের আকৃতি প্রকৃতি সকলেরই মৃত্যু হয়। তবে একই পুরুষে সেই শৈশব যৌবন জরার অনুভূত বিষয়ের স্মৃতিসকল অবস্থান করে বলিয়া আমরা তাহাকে মৃত্যু বলি না। যদি মরণের পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলে পৌর্ব্ব-দেহিক স্মৃতি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই মৃত্যুকে স্বীকার করিতাম না। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষ বা জীব অমর। কেবল মরণশীল প্রকৃতির বশে পড়িয়া তাহার যত মরণ। জগতে যত তুল্য ধর্ম্মা-পদার্থেরই একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে তাহার বৈপরীত্য ও বড় বৈচিত্র দেখা যায়। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি জড়, দুইটীই বড় বিরুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন, তথাপি এই জড়ে ও চেতনে, নিত্যে ও অনিত্যে, সত্যে ও মিথ্যায়, জলে ও আগুনে কি এক অপূর্ব্ব রমণীয় ভগবৎ—মূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ধন্য ভগবান্! ধন্য তাঁহার লীলা। ধন্য তাঁহার সৃষ্টি! তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ হইয়া ও সর্ব্বশক্তি-শূন্য। তাই সৃষ্টির জন্য পদে পদে প্রকৃতির পদে লুটাইতে থাকেন। প্রকৃতিকে লইয়াই তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। আর প্রকৃতিও তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে;—তাহার যুগ যুগান্তরের জন্ম জন্মান্তরের সাধ মিটাইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের দুইজনকে লইয়াই বিশ্বের সৃষ্টি। যদি জগতে কেবল পুরুষ থাকিত,—তাহা হইলে সৃষ্টি অসম্ভব হইত অথবা কেবল প্রকৃতি থকিলেও সৃষ্টি অসম্ভব হইত। সেই মহাপুরুষের তৃপ্তি ও প্রীতির জন্যই প্রকৃতির এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য। গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বিয়ৎ, অগ্নি, বিদ্যুৎ, পবন, জল, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, তরু, লতা, বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল, দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, নর, বানর, সিংহ ব্যাঘ্র, কীট, পতঙ্গ, জীবাণু এসকলই সেই মহাপুরুষের প্রকৃতির সন্তান। ইহারা সকলেই সেই পুরুষ প্রবরের কার্য্য করিবার জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও তাহারই আদেশে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্রূপ—এই দেহ, মন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, লজ্জা, মান, অপমান, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ রোগ, শোক, যৌবন, জরা, আরোগ্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, রস, রক্ত, মাংস মজ্জা, হস্ত, পদ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বায়ু, পিত্ত, কফ, এসকলই একটি পুরুষের অধিকৃত সন্তান। ইহারাও পুরুষের আদেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এই সংসারে পুরুষেরই

কার্য্য সাধন করিতেছে। ইহাদের দ্বারাই পুরুষ আপনার জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতির যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লয়। পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত এই দেহে বাস করিতে চায়, ততদিন ইহাদেরও আর বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও বা কখন কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার সমাধান করিয়া লয়। প্রকৃতির একমাত্র চেষ্টা পুরুষের তুষ্টি ও পুষ্টির বিধান করা।

যদিও পুরুষের জন্যই প্রকৃতির যাহা কিছু চেষ্টা, পুরুষের তৃপ্তিতেই তাহার তৃপ্তি; তথাপি সে একেবারে নিজের স্বভাবকে ত্যাগ করিতে পারে না। মেয়ে মানুষের যেমন স্বভাব, প্রকৃতিরও তাহাই। সে থাকিয়া থাকিয়া পুরুষের চেয়ে বড় হইতে চায়, মা কালীর মত ন্যাংটা হইয়া স্বামীর বুকে পা দিয়া নাচিতে চায়। সেজন্য পুরুষ সর্ব্বদা প্রকৃতিকে নিজের অধীনে রাখিয়া সংসারে সকল কার্য্যই করাইয়া লয়। যে প্রকৃতি পুরুষের আদেশ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করে না, সেই প্রকৃতিই সতী। আর যে প্রকৃতি পুরুষকে অতিক্রম করিয়া স্বৈরচারিণী হয়, সে অসতী। একই পদার্থে প্রকৃতি ও কর্ম্মভেদে নাম-ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষের একই প্রকৃতি ক্রিয়ার সত্যানুসারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটী আখ্যা রূপে কল্পিত হয়। নিবৃত্তির সন্তানজ্ঞান ও তদধীন বৃত্তিসমূহ এবং প্রকৃতির সন্তান মন ও তদধীন বৃত্তিসমূহ। একই দেহে জ্ঞান ও মন বাস করে। দেহে যখন জ্ঞানের রাজত্ব থাকে, তখন পুরুষের নিত্য স্বাস্থ্য, নিত্য আনন্দ, স্বর্গরাজত্ব, দেবতার সংসার। আর দেহে যখন মনের রাজত্ব হয়, তখন পুরুষের অনিত্য সুখ অনিত্য স্বাস্থ্য ও অনিত্য আনন্দ, দেহ নরক পুরী, দানবের লীলাক্ষেত্র। দিতি ও অদিতির স্বামী কশ্যপের দৈত্য ও দেবতা নামে যেমন দুইটী সন্তান, তদ্রূপ প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির অধিপতি পুরুষের মন ও জ্ঞান নামে দুইটী সন্তান। উহাদের প্রকৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ। সেজন্য দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় উহাদের বিরোধ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ এই দেহে নিবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহে বা মনে কোন প্রকার দুঃখের সংস্পর্শ ঘটে না এবং যখনই পুরুষ প্রবৃত্তির বশে মনের উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখনই তাহার নানাবিধ আধি ব্যাধি আসিয়া তাহাকে বিকল করিয়া দেয় ও মরণের পথে টানিয়া লইয়া যায়। এজন্য পুরুষকে সর্ব্বদা সাধু, গুরু ও সদ্বৈদ্যের আশ্রয় লইয়া চলিতে হয়। তাঁহারা তৎকালে পুরুষের দেহ ও মনের অবস্থা বিচার করিয়া সদ্বৃত্তি ও সদাচারের উপদেশ দানে অনুগৃহীত করেন; পুরুষও তাহাদের আদেশানুসারে বিধি-নিষেধ মানিয়া দেহকে দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করে। ইহার নাম স্বাস্থ্যরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষা, ইহারই নাম প্রকৃত দেহ ও মনের চিকিৎসা। এই চিকিৎসাতেই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। ইহা কোন দেশের কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শত্রু, মিত্র, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ বলিয়া পৃথক্ পদার্থ কিছুই নাই,